



চাঁদ তারা

চাঁদ ইমামের অরক্ষিত জীবনকথা

আরিফুল ইসলাম



প্রখ্যাত চার ইমামদের ব্যক্তিজীবন নিয়েই 'চার চার' বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারা কিভাবে বেড়ে উঠেন, কিভাবে ইলম অর্জন করেন, কিভাবে ইমামের আসন অলংকৃত করেন এবং শেষ জীবনে কিভাবে জুলুমের শিকার হোন; এই নিয়েই বইটি সাজানো।

ইমামদের জীবনের ঘটনাগুলো মূলত ধারাবাহিক গল্পাকারে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার জীবনের ঘটনাগুলোর 'প্রাইমারি সোর্স' —এর রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। আর বইয়ের 'লিমিটেশন' হলো- বাকি তিনজন ইমামের জীবনের ঘটনাগুলোর 'প্রাইমারি সোর্স' —এর রেফারেন্স না দিয়ে বইয়ের শেষে 'সেকেন্ডারি সোর্সগুলো' উল্লেখ করা হয়েছে। এবং তথ্যগুলো যাচাই করার জন্য একজন দক্ষ ইতিহাস পাঠকের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

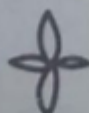
ইমামদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করার ছোট্ট প্রয়াস হিশেবেই মূলত বইটি। সংক্ষিপ্ত এই বইটি পড়ে পাঠকের মনে ইমামদের সম্পর্কে আরো জানার তৃষ্ণা তৈরি হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।





❖ লেখক :

আরিফুল ইসলাম



❖ প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা :

আহাম্মদুর রহমান

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে
শুনছিঃ

যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার পরিবর্তে তাকে জাহান্নামের পথসমূহের মধ্যে কোন একটি পথে পৌঁছে দেন। ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। জ্ঞানীর জন্য আসমান ও যমীনের যারা আছে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও দু‘আ প্রার্থনা করে, এমনকি পানির গভীরে বসবাসকারী মাছও। আবেদ (সাধারণ ইবাদাতগুজারী) ব্যক্তির উপর ‘আলিমের ফায়ীলাত হলো যেমন সমস্ত তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা। জ্ঞানীরা হলেন নাবীদের উত্তরসূরি। নাবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম মীরাসরূপে রেখে যান না; তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যান শুধু ইল্ম। সুতরাং যে ইল্ম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।

-আবুদাউদ হা/৩৬৪১, মিশকাত হা/২১২, তুহফুল জামে‘ হা/৬২৮৭

চার তারা

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ

মুহারররম, ১৪৪২ হিজরি/সেপ্টেম্বর, ২০২০ ঈসাব্দীয়

মুদ্রিত মূল্য : ১৬৪ (একশত চৌষাট্টি) টাকা

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.কম, ওয়াফী লাইফ
Dekhvo.com, আবাবিল (বুকশপ),

মুদ্রণ: বিশ্বাস প্রিন্টার্স
পাটুয়াটুলী, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশক

আযান প্রকাশনী

- 📍 ৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১০০০।
- ☎ +৮৮ ০১৭ ৫৯৫৯ ৯০০৮, ০১৭ ১৭৩১ ৭৯৩১
- ✉ azanprokashoni.2019@gmail.com
- 📌 azanprokashoni

সৃষ্টি পাঠ

✽ ইমাম আবু হাতিয়া

৮০-১৫০ হিজরি

১১

✽ ইমাম মালিক

৯৩-১৭৯ হিজরি

৩৭

✽ ইমাম আশ-শাফ'ঐ

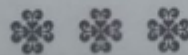
১৫০-২০৪ হিজরি

৫৩

✽ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল

১৬৪-২৪১ হিজরি

৭১





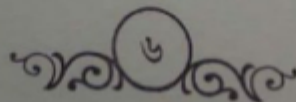
লেখকের কথা

চার মাজহাব, চার ইমাম বলতে আমরা সাধারণত বুঝি— চার মতাদর্শের চারজন ব্যক্তি। একজন যদি বলেন— ডানে যাও, তো আরেকজন বলেন— না, বামে যাও। অর্থাৎ, চার ইমাম মানে একে অন্যের সাথে 'যুদ্ধে' লিপ্ত থাকা চারজন ব্যক্তি!

যখন চার ইমাম সম্পর্কে জানতে গেলাম, পড়তে গেলাম, তখন যাস্ট অবাক হলাম। চারজনের জীবনী পড়ে যে মুগ্ধ হয়েছি, সেই মুগ্ধতা এখনো কাটেনি। চারজন সম্পর্কে জানার আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। আমরা মনে করতাম- চারজন মনে হয় চারজনের প্রতিপক্ষ। অথচ তাঁদের জীবনী পড়ে দেখলাম, তারা একে অন্যের প্রতিপক্ষ হওয়া তো দূরের কথা, তারা তো ছিলেন একে অন্যের সহযোগী, শুভাকাঙ্ক্ষী।

ইমাম আবু হানিফার প্রজ্ঞা সম্পর্কে ইমাম মালিক কী সুন্দর মন্তব্য মন্তব্য করেন। ইমাম আবু হানিফা নিজের প্রিয় ছাত্রকে পাঠান ইমাম মালিকের জ্ঞান আহরণের জন্য। ইমাম আশ-শাফেঈ ছিলেন ইমাম মালিকের ছাত্র। আবার ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ছিলেন ইমাম আশ-শাফেঈর ছাত্র। অন্যদিকে ইমাম আহমাদের বাল্যকালের শিক্ষক ছিলেন ইমাম আবু হানিফার প্রিয় ছাত্র। এ যেনো এক ফুলের মালা! বিভিন্ন বাগান থেকে, বিভিন্ন রকমের ফুল একটা মালায় গাঁথা!

ইমামদের ব্যক্তিজীবন নিয়েই 'চার তারা' বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তারা কিভাবে বেড়ে উঠেন, কিভাবে ইলম অর্জন করেন, কিভাবে ইমামের আসন অলংকৃত করেন এবং শেষ জীবনে কিভাবে জুলুমের শিকার হোন; এই নিয়েই বইটি সাজানো।



ইমামদের জীবনের ঘটনাগুলো মূলত ধারাবাহিক গল্পাকারে সাজানোর চেষ্টা করেছি। সেক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার জীবনের ঘটনাগুলোর 'প্রাইমারি সোর্স' —এর রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। আর বইয়ের 'লিমিটেশন' হলো- বাকি তিনজন ইমামের জীবনের ঘটনাগুলোর 'প্রাইমারি সোর্স' —এর রেফারেন্স না দিয়ে বইয়ের শেষে 'সেকেন্ডারি সোর্সগুলো' উল্লেখ করেছি। তথ্যগুলো যাচাই করার জন্য একজন দক্ষ ইতিহাস পাঠকের সহায়তা নিয়েছি।

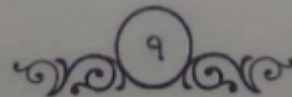
ইমামদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করার ছোট্ট প্রয়াস হিশেবেই মূলত বইটি লেখার প্ল্যান করি। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দাকে দিয়ে কাজটি করিয়েছেন।

বইটা পড়ে পাঠকের মনে ইমামদের সম্পর্কে আরো জানার তৃষ্ণা তৈরি হোক এটাই আমার প্রত্যাশা।

বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আযান প্রকাশনী করোনাকালে নানান ঝুঁকির মধ্য দিয়ে বইটি প্রকাশ করেছে। আল্লাহ তাঁদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

.....
“আম্মার এই লেখাগুলো যদি কারো মন কেড়ে নেয়
তা যেনো আম্মার নাম না এনে নাজাত এনে দেয়।”
.....

- আরিফুল ইসলাম
১১ জুলাই, ২০২০



❁ লেখক পরিচিতি :

আমি আরিফুল ইসলাম। ডাকনাম— আরিফ। পড়ালেখা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। লিখতে যতোটা না ভালোবাসি, তারচেয়ে বেশি পড়তে ভালোবাসি। পড়ার নির্যাসটুকু লেখার মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করি।

সেই প্রচেষ্টা ফুটে উঠেছে দুটো বইয়ে। সমকালীন প্রকাশন থেকে প্রকাশিত 'আর্গুমেন্টস অব আরজু' এবং সমর্পণ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত 'প্রদীপ্ত কুটির' বইয়ে। 'চার তারা' বইটি আমার তৃতীয় বই।

❖ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে আরো তিনটি বই।

১. ওপারেতে সর্বসুখ (সমকালীন প্রকাশন)
২. তারা ঝলমল (সমর্পণ প্রকাশন)
৩. খোপার বাঁধন (সমর্পণ প্রকাশন)



প্রকাশকের কথা

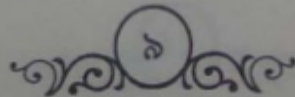
চার ইমাম। ইমাম নুমান বিন সাবিত, ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম শাফে'য়ী এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল। রাহিমাহুল্লাহ। সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন) দের পরের প্রজন্ম। সত্য যুগের মানুষ। ইসলামের চার চারটি নক্ষত্র। তারকাখচিত চারটি জীবনসাধনা। ইসলামের জন্য যাদের ত্যাগ ও বিসর্জন আকাশছোঁয়া। যুহুদের সর্বোচ্চ চূড়ায় যাদের একচ্ছত্র অবস্থান। যাদের প্রতি এই উম্মাহর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং দরদের কমতি নেই। যাদের পদচারণা অনুসরণ করে কতশত মনীষী, কতশত তুলিবুল ইলম দ্বীনের বিগ্ধ 'ইলম হাসিল করেছে। ইতিহাস এই চারটি নক্ষত্রকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। তাদের নামের শেষে দরদভরা কণ্ঠে দুআ হিসেবে বলবে, "রাহিমাহুল্লাহ"।

এই চার ইমামের জীবনচরিত কেমন ছিল? তাদের জন্ম, মৃত্যু, বেড়ে ওঠা, ইলমপিপাসা, জ্ঞানসাধনা, দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা, 'ইলম হাসিলের জন্য ত্যাগ তিতিক্ষা, নিজেদের জীবনে লব্ধ 'ইলমের বাস্তবায়ন, আমৃত্যু তার উপর অটল থাকা - ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আযান প্রকাশনীর এবারের বই। বিগ্ধ তথ্য ও দলিলভিত্তিক এই বইটির নামকরণ করা হয়েছে "চার তারা"

বইটি সংকলন করেছেন সুপরিচিত সুলেখক মুহতারাম আরিফুল ইসলাম।

এই রমাদ্বানে আসছে, আপনাদের দুআ ও ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই,
ইন শা আল্লাহ! ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ!

— প্রকাশক,
আযান প্রকাশনী।





ইমাম আবু হানিফা

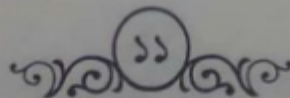
ইমানদীপ্ত ধীমান

✽ এক ✽

কুফা, খুলাফায়ে রাশেদার সর্বশেষ রাজধানী। উমর (রা:)’র খিলাফতকালে শহরটির পত্তন হয়। এই শহরে বসবাস করেন রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক প্রিয় সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাস’উদ (রা:)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে চারজনের কাছ থেকে কুরআন শেখার জন্য সাহাবীদেরকে পরামর্শ দেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস’উদ (রা:) ছিলেন তাদের একজন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস’উদের (রা:) আগমনের ফলে কুফা খ্যাতি লাভ করে ‘কুরআনের শহর’ নামে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস’উদ (রা:) ছাড়াও রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায় সহস্রাধিক সাহাবী কুফায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তারমধ্যে চব্বিশজন ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। [তাবাকাত ইবনে সা’দ: ৬/৯]

কুফা নানান মতালম্বী মানুষের আবাসস্থল। শি’আ, মুতাজিলা, খারেজীদের ‘হোম টাউন’ বলা যায় এই শহরকে। এই শহরের মসজিদে হত্যা করা হয় ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলীকে (রা:)। ইসলাম-পূর্ব খ্রিস্টানদের নানান মতালম্বীদের



❁ চার তারা

মধ্যে যেমন বিতর্ক হতো এই শহরে, ইসলাম আগমনের পরও মুসলমানদের মধ্যকার নানান গ্রুপের বিতর্কস্থল হয়ে উঠে শহরটি।

[* 'ঈমানদীপ্ত ধীমান' শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ করলে হয় ঈমানদার জ্ঞানী। অর্থাৎ, একইসাথে ঈমান এবং জ্ঞানের সমন্বয় ঘটেছে এমন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার সালমান আল-ফারসীর (রা:) উপর হাত রেখে বললেন, "ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের (সর্বোচ্চ নক্ষত্র) নিকট থাকলেও আমাদের কিছু লোক অথবা তাদের এক ব্যক্তি অবশ্যই তা পেয়ে যাবে।"

[সহীহ বুখারী: ৪৮৯৭] এই হাদীসের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুহাদ্দিসগণ বলেন, "পারস্যের কোনো এক লোক" বলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। বুখারীর এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী, আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে মত পোষণ করেন [তাবেঈদ আল-সহীফা, পৃষ্ঠা ৪০৩]।

আল্লাহ কুরআন নাজিল করেন আরবি ভাষায়। কুরআনের বাণী সর্বপ্রথম গ্রহণ করে আরবরা। কিন্তু, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকালের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই বিশ্ব-ধর্মের বেশিরভাগ ফকীহ হয়ে উঠেন অনারব। আরবি কুরআন, আরবি হাদীসের উপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে অনেকেই অবাক হন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ঈসা ইবনে মূসা নামের এক ধার্মিক ব্যক্তি।

একবার ঈসা ইবনে মূসা ইবনে আবী লাঈলাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইরাকের সবচেয়ে বড় ফকীহ কে?"

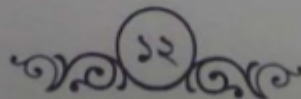
— হাসান আল-বসরী।

— তারপর কে?

— মুহাম্মদ ইবনে সিরিন।

— তারা কারা?

— তারা দুজন অনারব।



- মক্কার সবচেয়ে বড় ফকীহ কারা?
- আতা ইবনে আবী রাবাহ, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর।
- তারা কারা?
- তারা সবাই অনারব।
- মদীনার সবচেয়ে বড় ফকীহ কারা?
- যাঈদ ইবনে আসলাম, মুহাম্মদ ইবনে আল মুনকাদির এবং নুজাইহ ইবনে আবি নুজাইহ।
- তারা কারা?
- তারাও অনারব।

‘তারাও অনারব’ কথাটি শুনে ঈসা ইবনে মূসার মুখের রঙ পরিবর্তন হয়ে যায়। ইসলামের সবগুলো প্রধান শহরের প্রধান ফকীহগণ অনারব এই কথাটি যেন তিনি মেনে নিতে পারছেন না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, “কুবার সবচেয়ে বড় ফকীহ কারা?”

- রাবী’আ আর রা’ঈ, ইবনে আবি’জ জিনাদ।
- তারা কারা?
- তারাও অনারব।

উত্তর শুনে ঈসা ইবনে মূসার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়েমেনের ফকীহ কারা?”

- তাউস, তাঁর ছেলে এবং ইবনে মুনাব্বাহ।
- তারা কারা?
- তারাও অনারব।

চার তারা

এবার আর তিনি বসে থাকতে পারলেন না। বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন।
“তাহলে খোরাসানের ফকীহ কে?”

— আতা ইবনে আব্দুল্লাহ আল-খুরাসানী।

— তিনিও কি অনারব?

— হ্যাঁ, তিনিও অনারব।

রাগে গজগজ করা শুরু করলেন ঈসা ইবনে মুসা। কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে আবার
জিজ্ঞেস করলেন, “সিরিয়ার ফকীহ কে?”

— মাকহুল।

— এই মাকহুলটা আবার কে?

— একজন অনারব।

আবারো ‘অনারব’ শুনে ঈসা ইবনে মুসা জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন।
মনে হচ্ছিলো, এই মূহুর্তে তিনি হার্ট-অ্যাটাক করবেন। শেষবারের মতো
জিজ্ঞেস করলেন, “কুফার ফকীহ কারা?”

ইবনে আবী লাঈলা মনে মনে ভাবলেন, যদি আমি বলি কুফার সবচেয়ে বড়
ফকীহ হলেন আল হাকিম ইবনে উত্ববা এবং হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান,
আর তারাও অনারব, তাহলে হয়তো লোকটা মারা যাবে। লোকটার ভয়ে তিনি
বললেন, “ইব্রাহিম আন নাখাই এবং আশ-শা’বী।

— তারা কারা?

— তারা দুজন আরব।

এবার নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈসা ইবনে মুসা চিৎকার দিয়ে উঠলেন- আল্লাহ
আকবার! অবশেষে তিনি প্রাণ ফিরে পেলেন। যাক, কুফায় অন্তত আরব
ফকীহরা মর্যাদার আসনে আছেন।

❖ দুই ❖

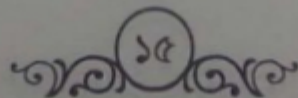
সাবিত ইবনে যোতী নামের কুফার এক ধানাত্য কাপড়ের ব্যবসায়ী। খলিফা আলীর (রা:) সাথে তাঁর বাবার সুসম্পর্ক ছিলো। ছোটবেলায় তিনি মাঝেমাঝে বাবার সঙ্গে খলিফার সাথে দেখা করতে যেতেন।

সাবিতের বাবা নববর্ষের দিন খলিফার জন্য ফালুদা নিয়ে যেতেন। পারস্যের ফালুদা আলীর (রা:) খুব পছন্দের। ফালুদা খেয়ে তিনি শিশু সাবিত এবং তাঁর পরবর্তী বংশ-প্রজন্মের জন্য দু'আ করতেন।

৮০ হিজরীতে সাবিতের ঘরে এক পুত্র শিশুর জন্ম হয়। ছেলের নাম রাখেন নুমান। নুমান বিন সাবিত। তৎকালীন সময়ের ধনী পরিবারগুলোর একটা রীতি ছিলো। পরিবারগুলো তাদের ছেলেমেয়েদেরকে বাল্যকালে কুরআন হাফেজ বানাতো। সেই রীতি অনুযায়ী, নুমান বিন সাবিতও বাল্যকালে কুরআন মুখস্ত করেন। সুমধুর তেলাওয়াতের গুণটিও তারমধ্যে ছিলো। প্রসিদ্ধ সাত কিরাতের মধ্যে আসিমের কিরাত তিনি ফলো করতেন।

ছোটবেলা থেকেই নুমান বাবার মতো কাপড়ের ব্যবসায় যোগ দেন। কিন্তু, অতিরিক্ত মুনাফাজর্জন করতে গিয়ে তিনি মিথ্যের আশ্রয় নেননি। ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা এবং আমানতদারীতাকে পূঁজি করেই তিনি ব্যবসা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “ক্ষেত্র-বিক্ষেত্র একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা উভয়েই সত্য কথা বলে ও পণ্যের দোষ-ত্রুটি যথাযথ বর্ণনা করে, তবে তাদের কেনাবেচায় বরকত হবে। আর যদি তারা মিথ্যে কথা বলে এবং ত্রুটি গোপন করে, তবে তাদের কেনাবেচায় বরকত নষ্ট হয়ে যাবে।” [সহীহ বুখারী: ২১১০]



❁ চার তারা

ব্যবসা করতে গিয়ে নুমান বিন সাবিত রাসূলের (সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়া সাদ্বাম) এই হাদীসটির কথা সর্বদা মাথায় রাখতেন। বিক্রেতা হিশেবে কাপড়ের দোষ-ত্রুটি গোপন করতেন না, ক্রেতা হিশেবে বিক্রেতাকে ঠকাতেন না।

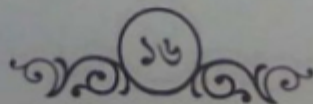
হাফস বিনতে আব্দুর রহমান নামের তাঁর একজন বিজনেস পার্টনার ছিলেন। একবার কিছু ত্রুটিপূর্ণ কাপড় হাফস এর কাছে পাঠালেন। তাকে বলে দিলেন, বিক্রি করার সময় তিনি যেন ক্রেতাকে সেটা জানিয়ে দেন। কিন্তু, ভুলক্রমে হাফস সেটা ক্রেতাকে জানাতে ভুলে যান। কার কাছে কাপড়টি বিক্রি করেছেন সেটাও মনে নেই। নুমান এটা জানতে পেরে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। তিনি পুরো কাপড়ের অর্থ দান করে দেন। অনিচ্ছাকৃত ভুল সত্ত্বেও সেদিনের পুরো অর্থ দান করতে তিনি কার্পণ্য করেননি।

[আল-খায়রাত আল-হিসান, ইবনে হাজার আল-হায়তামী, পৃষ্ঠা-১৪০]

রাসূলুল্লাহ (সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়া সাদ্বাম) ব্যবসায়ীদেরকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, “হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! শয়তান ও গুনাহ ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় এসে হাজির হয়। অতএব, ব্যবসায়ের সাথে তোমরা দান-খয়রাতও যুক্ত করো।” [জামে আত-তিরমিজি: ১২০৮]

ত্রুটিপূর্ণ উপার্জনই কেবল তিনি দান করতেন না। দান করাটা ছিলো তাঁর নিত্যকার আমল। উপার্জিত অর্থ থেকে ৪০০০ দিরহাম রেখে বাকি অর্থ তিনি দান করে দিতেন। পরবর্তীতে তাঁর ছেলেকেও দানশীলতা শেখানোর জন্য প্রতিদিন তাকে ১০ দিরহাম দিতেন। বাবার দেখাদেখি ছেলেও দানশীলতার গুণটি রপ্ত করে নেয়। প্রতি শুক্রবারে তিনি নিজে ২০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দান করতেন।

পণ্যের দাম নির্ধারণে একেকজন একেক নীতির অনুসরণ করে। কেউ দরকষাকষি করতে পছন্দ করে, কেউবা একদরে বিক্রি করতে পছন্দ করে। নুমান ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ‘একদর’ নীতি অনুসরণ করতেন। পণ্যের দরদাম করে সময় নষ্ট করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিলো না। কেনা দামের চেয়ে একটু দাম বাড়িয়ে তিনি মুনাফার্জন করতেন। একদামে বিক্রি করতেন বলে ক্রেতাকে ঠকাতেন এমন না। উপরন্তু, তিনি গরীব, বৃদ্ধা এবং বেকারদের কাছ থেকে মুনাফার্জন করতেন না। ব্রেক-ইভেন মূল্যে পণ্য বিক্রি করতেন।



একবার এক মহিলা এসে তাঁকে বললো, “আমি খুবই নিঃস্ব। আপনি আমাকে এই জামাটি আপনার কেনা দামে বিক্রি করুন।”

— নুমান তাঁকে বললেন, “আপনি তাহলে চার দিরহাম দিন।”

বৃদ্ধা মহিলা দাম শুনে ভাবলো নুমান তাঁর সাথে মজা করছেন। কারণ, এই কাপড়ের দাম অনেক বেশি হবার কথা। এতো কম দামে তিনি জামাটি কিনতে পারবেন সেটা তিনি ভাবতেও পারেননি।

— নুমান বললেন, “আমি দুটো কাপড় কিনেছি। একটি কাপড় বিক্রি করে আমি যা পেয়েছি সেই মূল্য কেনা দামের চেয়ে চার দিরহাম কম। আপনি চার দিরহাম দিয়ে এটা কিনে নিলে আমি আমার কেনা দামটি পেয়ে যাবো।”

কেবল বিক্রি করার সময়ই ছাড়ে বিক্রি করতেন এমন না। কেনার সময়ও তিনি বিক্রেতাকে প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করতেন। বিক্রেতার অজ্ঞতাকে তিনি ‘সুযোগ’ হিসেবে নিতেন না।

একবার এক মহিলা তাঁর কাছে একটি কাপড় বিক্রি করতে আসলো।

— তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কতো টাকায় এটা বিক্রি করবেন?”

— মহিলা বললো, “একশো দিরহাম।”

— নুমান কাপড়টি ভালো করে পরীক্ষা করলেন। মহিলাকে বললেন, “এই কাপড়ের দাম এরচেয়েও বেশি।”

— মহিলা এবার দাম বাড়ালো। “দুইশো দিরহাম দিন।”

— নুমান বললেন, “না, আরো বেশি।”

— এবার মহিলা ভাবলো, নুমান তাঁর সাথে মজা করছেন। মানুষ কি এতো বোকা যে কম দামে পেয়েও না কিনে দাম বাড়াবে?

নুমান ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বললেন, “তাহলে এক কাজ করলে কেমন হয়,

✽ চার তারা

পাশের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে নিই কাপড়টির আসল দাম কতো।” মহিলা রাজী হলো। পাশের দোকানদার কাপড়টি দেখে বললো, “এর মূল্য তো পাঁচশো দিরহাম।” শেষমেশ, মহিলাকে পাঁচশো দিরহাম দিয়ে নুমান কাপড়টি কিনলেন।

একজন সৎ, আমানতদার ব্যবসায়ী হিশেবে নুমানের দিন ভালোই চলছিলো। নিয়মিত বাজারে যেতেন। কেনাবেচা করতেন, বাড়ি ফিরতেন। নিত্যকার রুটিনের মতো তিনি একদিন বাজারে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর বয়স বাইশের কোঠায়। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধ তাঁকে ডাক দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায় যাচ্ছে?” নুমান বললেন, “আমি বাজারে যাচ্ছি।”

বৃদ্ধ মূলত জানতে চাচ্ছিলেন, ‘তুমি কার কাছে পড়াশোনা করো?’ বৃদ্ধ আবার প্রশ্ন করলে নুমান ঝটপট জবাব দিলেন, “আমি কারো কাছে পড়তে যাই না।” যুবকের কথা শুনে বৃদ্ধ বেশ অবাক হলেন। এই যুবকের মধ্যে তিনি স্পষ্ট প্রতিভার ঝলক দেখতে পাচ্ছেন আর সে কি-না পড়াশোনা করে না!

নুমানকে তিনি কাছে ডেকে নিলেন। বৃদ্ধ নুমানকে বুঝালেন, “দেখো, তোমার মধ্যে আমি প্রতিভার এক চাপা আলো দেখতে পাচ্ছি। আমি চাই, তুমি জ্ঞানী-গুণীদের সাথে উঠাবসা করো।”

উপদেশটা নুমানের অন্তরে দাগ কাটলো। বৃদ্ধ কী আত্মবিশ্বাসের সাথে বলছেন— তোমার মধ্যে প্রতিভার ছাপ আছে! এই একটা কথা তাঁর মনের মধ্যে সুনামির (Tsunami) সৃষ্টি করলো। বৃদ্ধের কথা তো ফেলনা না, আর তিনি তো যেনতেন লোকও না। এই বৃদ্ধ হলেন কুফার শ্রেষ্ঠ ইমাম ইমাম আশ শা’বী (রাহিমাহুদ্দাহ)। (ফুটনোট: ঈসা ইবনে মুসা ইবনে আবী লাঈলাকে কুফার শ্রেষ্ঠ ইমামের কথা জানতে চাইলে তিনি ইমাম আশ শা’বীর কথা বলেন।)

মানিকে মানিক চিনে। কুফার শ্রেষ্ঠ ইমাম আশ শা’বী বাজারমুখী যে যুবককে জ্ঞানমুখী করেন পরবর্তীকালে সেই যুবক সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন ‘ইমাম আবু হানিফা’ নামে।

✱ তিন ✱

আবু হানিফার ছিলো পার্টনারশিপ বিজনেস। তাঁর আরেক পার্টনার ছিলেন হাফস বিনতে আব্দুর রহমান। আবু হানিফা জ্ঞান অন্বেষণ শুরু করলে হাফস বিনতে আব্দুর রহমান তাঁকে অনুপ্রেরণা দেন- “তুমি জ্ঞান আরোহণে ব্যস্ত থাকো, আমি না-হয় ব্যবসা নিয়ে থাকি।” সহযোগীর কাছ থেকে এমন উৎসাহ পেয়ে আবু হানিফা সম্পূর্ণরূপে নিজেকে জ্ঞানার্জনে মননিবেশ করেন।

কিন্তু কার কাছে গিয়ে শিখবেন? কোন বিষয় নিয়ে পড়বেন? প্রথমে এটা নিয়ে তিনি বিড়ম্বনায় পড়েন। পড়ালেখা করার জন্য তিনটি ডিপার্টমেন্ট আছে।

- দর্শন
- হাদীস
- ফিকহ

তিনি একে একে সবগুলো ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে খোঁজ নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্টের আলাদা আলাদা ক্লাসরুমের মতো তিনিও আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্টে ঢুকতে লাগলেন। দর্শন চর্চার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা ছিলো বসরা। আবু হানিফা কমপক্ষে বাইশবার সেখানে যান। সেখানকার বিভিন্ন গ্রুপের সাথে বিতর্ক করেন। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হাদীস শিখেন, আরবী ভাষারীতি এবং কবিতা শিখেন। ফিকহ শিখতে গিয়ে ফিকহের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। শেষপর্যন্ত মনঃস্থির করেন ফিকহ শিখবেন। (ফুটনোট: বর্তমান সময়ের শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে আবু হানিফা অনার্স, মাস্টার্স করেন ফিকহের উপর)

আবু হানিফাকে এবার একজন পার্মানেন্ট শিক্ষকের কাছে ভর্তি হতে হবে। একজন শিক্ষক একটা ডিপার্টমেন্টের মতো। আবার কোনো কোনো শিক্ষক একেকটা ফ্যাকাল্টি বা একেকটা ভার্চুয়ালিটির মতো সকল বিষয়ে পারদর্শী।

❁ চার তারা

আবু হানিফা তাঁর শিক্ষক হিশেবে বেছে নিলেন হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমানকে (রাহিমাহুল্লাহ)। হাম্মাদ হলেন কুফার বিখ্যাত ইমাম। তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একান্ত সেবক আনাস ইবনে মালিকের (রা:) কাছে থেকে হাদীস শুনছেন। বিখ্যাত তাবেঈদের মধ্য থেকে হাসান আল-বসরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, সাঈদ ইবনে যুবাইর, আমীর আল-শাইবী ছিলেন হাম্মাদের শিক্ষক।

প্রথমদিন পড়তে গিয়ে হাম্মাদের বাম পাশের সারিতে আবু হানিফার স্থান হয়। কয়েকদিন ক্লাস করার পর আবু হানিফা হাম্মাদের নজর কাড়েন। তাঁর মেধা, যোগ্যতা আর স্মৃতিশক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখে হাম্মাদ আবু হানিফাকে তাঁর কাছে বসার সুযোগ দেন। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে দারুণ এক সম্পর্ক তৈরি হয়। অন্যদিকে, আবু হানিফা হাম্মাদকে এতোটাই সম্মান করতেন যে, হাম্মাদের বাড়ির দিকে তিনি পা দিয়ে বসতেন না।

হাম্মাদের কাছে পড়ালেখা করার পাশাপাশি আবু হানিফা অন্যান্য শিক্ষকের ক্লাসগুলোতেও যেতেন। মক্কার শ্রেষ্ঠ ফকীহ আতা ইবনে আবী রাবাহ (রাহিমাহুল্লাহ), যার সম্পর্কে উমরের (রা:) পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) বলেন, “আতাহ ইবনে রাবাহ থাকতে লোকেরা আমার কাছে ফতোয়া চাইতে আসে কেন?”

আবু হানিফা মক্কায় গিয়ে আতাহ ইবনে রাবাহর কাছে হাদীস শিখেন। আবু হানিফার প্রতিভায় বিস্মিত হয়ে আতাহ প্রতিদিন ক্লাস শুরু হবার আগে সবাইকে সরিয়ে আবু হানিফাকে কাছে বসাতেন।

আবু হানিফা মদীনাতে গেলো তাঁর সাথে দেখা হয় ইমাম মুহাম্মদ আল বাকেরের (রাহিমাহুল্লাহ) সাথে। ইমাম বাকের মনে করতেন আবু হানিফা হাদীসের চেয়ে নিজের যুক্তিকে বেশি প্রাধান্য দিতেন।

আবু হানিফাকে দেখামাত্র ইমাম বাকের জিজ্ঞেস করলেন, “ও! তাহলে তুমিই সেই ব্যক্তি যে কিনা নিজের বিচার বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে নবীর হাদীসের সাথে বিরোধিতা করো?” আবু হানিফা বুঝতে পারলেন ইমাম বাকের তাঁর

সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করেন। তিনি ইমাম বাকেরের কাছে বিনয়ের সাথে সুযোগ চাইলেন এই অভিযোগকে ভুল প্রমাণের। ইমাম বাকের অনুমতি দিলে আবু হানিফা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “পুরুষ দুর্বল নাকি নারী দুর্বল?”

- নারী দুর্বল।
- উত্তরাধিকার আইনে পুরুষের অংশ বেশি নাকি নারীর অংশ?
- পুরুষের।
- আমি যদি নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে ফতোয়া দিতাম তাহলে বলতাম, নারীদের বেশি সম্পদ দেয়া হোক। কারণ, দুর্বলরাই তো বেশি পাবার হকদার।

আবু হানিফা আবার প্রশ্ন করলেন, “নামাজ বেশি উত্তম নাকি রোজা?”

- নামাজ।
- সে হিশেবে ঋতুবর্তী মহিলাদের নামাজের ক্বাজা ওয়াজিব হওয়া উচিত, রোজার নয়। অথচ আমি রোজার ক্বাজা আদায়ের ফতোয়া দেই।

আবু হানিফার কথা শুনে ইমাম বাকের বুঝতে পারলেন আবু হানিফা সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি ভুল। তিনি উচ্ছসিত হলেন। আনন্দের আতিশায়ে আবু হানিফার কপালে চুমু খেলেন। ইমাম বাকেরের সান্নিধ্যে আবু হানিফা বেশ কিছুকাল কাটান। তাঁর কাছ থেকে ফিকহ ও হাদীস শিখেন।

একবার আবু হানিফা সাক্ষাৎ করেন তৎকালীন সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম, ইমাম মালিকের সাথে। ইমাম মালিক তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন, যথাযথ সম্মান দেখান।

আবু হানিফা চলে যাবার পর ইমাম মালিক তাঁর শিক্ষার্থীদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, “তোমরা কি জানো একটু আগে কে এসেছিলেন?”

❁ চার তারা

শিক্ষার্থীরা বললো, “না।” অতঃপর ইমাম মালিক এক বাক্যে ইমাম আবু হানিফাকে বর্ণনা করেন, “উনি হলেন আবু হানিফা। উনি যদি চান তাহলে এই কাঠের খুঁটিগুলোকে সোনার খুঁটিতে প্রমাণ করবেন, তাহলে তোমরা তাঁর যুক্তি শুনে মেনে নিতে বাধ্য হবে।” [সিয়ারু আ’লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী: ৬/৩৯৯]

বিভিন্ন শহর ঘুরে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস’উদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:ম) এর ফিকহ শিখেন। কোন প্রেক্ষাপটে তারা কী ফতোয়া দিতেন সেগুলো তিনি আত্মস্থ করেন।

কারো কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করতে আবু হানিফা সংকোচবোধ করতেন না; হোক সে একজন মুচি বা নাপিত। প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলে কেউ যদি তাঁকে সংশোধনের চেষ্টা করতো, তবে সেটা তিনি নির্দিধায় মেনে নিতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা মু’মিনের হারানো সম্পদ। সুতরাং সে যেখানেই তা কুড়িয়ে পাবে, সেই হবে তার অধিকারী।” [জামে আত-তিরমিজিঃ ২৬৮৭, হাদীসটি দঈফ]

একবার মক্কায় গিয়ে আবু হানিফা এক নাপিতের কাছে চুল কাটতে গেলেন। চুল কাটার কিছু সুন্নাত আছে। যেমন —

- কিবলামুখী হয়ে বসা
- ডানদিক থেকে চুল কাটা শুরু করা
- চুল কাটা শেষ হলে চুলগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলা।

ভুলবশত আবু হানিফা এই সুন্নাত আমলগুলো করতে ভুলে যান কিংবা তাঁর জানা ছিলো না। নাপিত তাঁকে শুধরিয়ে দিলো— কিবলার দিকে মুখ করে বসুন, চুল কাটা ডান পাশ দিয়ে শুরু করুন, আপনার চুলগুলো পুঁতে ফেলুন।

[আল-বাহর আর-রাইক, ইবনে নুজাইম আল-হানাফী: ৭/১৩]

নাপিতের কাছ থেকে সংশোধনী পেয়ে তিনি জেদ ধরে বসেননি, ‘তুমি বলার কে?’ বরং নাপিতের সংশোধনী তাঁর জ্ঞান এবং ব্যক্তিত্বের কাছে বাধা হয়ে

দাড়াইনি। উল্টো তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, “এগুলো তুমি কার কাছ থেকে শিখেছো?” নাপিত বললো, “আতা ইবনে আবি রাবাহ’র কাছ থেকে।”

[ওয়াফাত, ইবনে খাল্লিকান: ৩/২৬১-২৬২]

❀ চার ❀

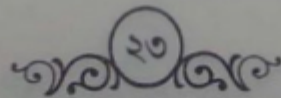
হাম্মাদের সান্নিধ্যে আবু হানিফার দশ বছর পূর্ণ হলো। এবার আবু হানিফার মনে হলো তিনি শিক্ষকতা করাতে পারবেন। কিন্তু, একথা তাঁর শিক্ষককে কিভাবে বলবেন? To be or not to be, বলবেন কি বলবেন না এই নিয়ে তিনি যখন দুটানার মধ্যে তখন হাম্মাদের কাছ থেকে এলো সুবর্ণ সুযোগ।

বসরায় হাম্মাদের এক আত্মীয় মারা যান। তাঁর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন হাম্মাদ। উত্তরাধিকার সম্পদ দেখাশোনার জন্য হাম্মাদকে কয়েকদিনের জন্য কুফা থেকে বসরায় যেতে হবে। এই কয়দিনের জন্য তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্র আবু হানিফাকে তাঁর আসনে বসিয়ে যান।

আবু হানিফা এবার শিক্ষকের আসনে বসলেন। নানান প্রান্ত থেকে তাঁর কাছে প্রশ্ন আসতে শুরু হলো। কিছু প্রশ্ন তাঁর শিক্ষক তাঁকে শিখিয়েছেন, কিছু প্রশ্ন একেবারে নতুন। নতুন প্রশ্নগুলো নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। প্রশ্ন এবং তাঁর গবেষণালব্ধ উত্তর দুটোই লিখে রাখলেন। হাম্মাদ আসলে তাঁকে দেখাবেন।

দুই মাস পর হাম্মাদ বসরা থেকে ফিরলেন। এই দুই মাসে আবু হানিফার কাছে ষাটটি নতুন প্রশ্ন আসে। তিনি প্রশ্ন এবং উত্তর দুটোই তাঁর শিক্ষককে দেখান। হাম্মাদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উত্তরগুলো দেখে বলেন, “তোমার ষাটটি উত্তরের মধ্যে চল্লিশটি সঠিক।” ভুল উত্তরগুলো তিনি সংশোধন করে দিলেন।

দুই-তৃতীয়াংশ উত্তর সঠিক হওয়া সত্ত্বেও আবু হানিফা বুঝতে পারলেন তাঁর এই মুহূর্তে শিক্ষক হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা হয়নি। তিনি সংকল্প করলেন, যতোদিন তাঁর শিক্ষক হাম্মাদ বেঁচে আছেন ততোদিন পর্যন্ত ছাত্র হয়ে তাঁর সান্নিধ্যে কাটাবেন।



❁ চার তারা

আবু হানিফা হাম্মাদের সান্নিধ্যে আরো দশ বছর থাকার পর ১২০ হিজরীতে হাম্মাদ ইন্তেকাল করেন। হাম্মাদের আসনে এবার কে বসবেন? হাম্মাদের সান্নিধ্যে প্রায় বিশ বছর কাটানো অভিজ্ঞ ছাত্র আবু হানিফাকে সবাই অনুরোধ করলো— আপনি এবার শিক্ষকের আসন অলঙ্কৃত করুন। ইমাম আবু হানিফা যখন শিক্ষকের আসনে বসলেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর।

❁ পাঁচ ❁

পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা ছিলেন বেশ রুচিশীল। নিজে যেমন মার্জিত পোশাক পরতেন, অন্যদেরকেও মার্জিত পোশাক পরার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। একবার তাঁর এক ছাত্রকে নোংরা পোশাক পরা অবস্থায় দেখলেন। তাঁকে বললেন, “ক্লাস শেষ হবার পর তুমি আমার সাথে দেখা করে যেও।” ক্লাস শেষ হলে তিনি ছাত্রকে বললেন, “ঐ জায়নামাজটির নিচে কিছু জিনিস রাখা আছে। সেগুলো নিয়ে যাও।” ছাত্রটি জায়নামাজ তুলে দেখলো সেখানে এক হাজার দিরহাম রাখা। সে একসাথে এতো টাকা দেখে বেশ অবাক হলো। ইমাম আবু হানিফা তাঁর কৌতুহল মেটানোর জন্য বললেন, “এই টাকাগুলো নিয়ে তুমি নতুন জামা কিনবে।” ছাত্রটি এবার দ্বিগুণ বিস্মিত হলো। সে বললো, “আমি তো সামর্থ্যবান। আমার তো এই টাকার দরকার নাই।”

ইমাম আবু হানিফা ছাত্রকে একটা হদীস স্মরণ করিয়ে দিলেন। “আব্বাহ যখন তাঁর বান্দাকে কোনো নিয়ামত দান করেন, তখন তিনি তাঁর বান্দার মধ্যে নিয়ামতের চিহ্ন দেখে খুশি হন।” [গুয়াবুল ঈমান: ৫৭১৯]

অর্থাৎ, বুঝলাম, তুমি সামর্থ্যবান। কিন্তু, তোমার সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ কই? সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নোংরা পোশাক পরে আছো কেনো?

[তারিখ বাগদাদ, খতিব আল-বাগদাদী: ১৩/৩৬১]

এক লোকের কাছে তিনি দশ হাজার দিরহাম পাবেন। লোকটি তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে লজ্জায় তাঁকে এড়িয়ে চলতো। তিনি খেয়াল করলেন, লোকটি না পারছে তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে আর না পারছে তাঁর সামনাসামনি হতে। ইমাম আবু হানিফা নিজেই বরং লোকটির কাছে গিয়ে বললেন, “দেখো, তুমি যদি ঋণ পরিশোধ করতে না পারো, তাহলে অসুবিধে নেই। আমি তোমাকে টাকাগুলো গিফট দিয়ে দিলাম। টাকার জন্য অন্তত তুমি আমাকে এড়িয়ে চলো না।” [আল-খায়রাত আল-হিসান, ইবনে হাজার আল-হায়তামী, ১৩৬]

টাকার জন্য একটা সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে, এটা যেন তিনি মেনে নিতে পারতেন না। টাকা তো আসবে-যাবে। কিন্তু, মানুষের সাথে সম্পর্কটা যদি ভালোমতো হয়, সেটা বিচারদিবসেও কাজে আসবে।

ইব্রাহিম ইবনে উয়াইনাহ নামের এক বিদ্বান একজনের কাছে ৪০০০ দিরহামের ঋণী ছিলেন। ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য তাঁর ছিলো না। এই করুণ দশা দেখে তাঁর এক বন্ধু তাঁর জন্য টাকা সংগ্রহ শুরু করলো। ইমাম আবু হানিফার কাছে গিয়ে ঘটনাটি বললে তিনি পুরো টাকাগুলো দিয়ে ইব্রাহিমকে ঋণমুক্ত করেন।

[আল-খায়রাত আল-হিসান, ইবনে হাজার আল-হায়তামী, পৃষ্ঠা ১৩৭]

ছাত্রাবস্থায় ইমাম আবু হানিফা তাঁর মুনাফার একটা অংশ শিক্ষকদের পেছনে ব্যয় করতেন। যখন তিনি শিক্ষক হলেন তাঁর সম্পদের উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর ছাত্রদের পেছনে ব্যয় করা শুরু করলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে স্কলারশিপ দিতেন।

তাঁর প্রধান ছাত্রের একজন ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ)। যৌবনে তাঁর মধ্যে ইমাম শা'বী যেমন প্রতিভার ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন, ইমাম আবু হানিফাও তেমনি আবু ইউসুফের মধ্যে প্রতিভার ছাপ দেখতে পান। আবু ইউসুফ যাতে এক মনে পড়ালেখা করতে পারেন, পরিবারের আর্থিক অবস্থা নিয়ে যাতে টেনশন করতে না হয় সেজন্য ইমাম আবু হানিফা আবু ইউসুফের পরিবারের দেখাশোনার ভার নিজের কাঁধে নেন। নিজের পরিবারের জন্য তিনি যতোটুকু খরচ করতেন, সমপরিমাণ অর্থ তিনি দান করতেন।

[সিয়ারু আ'লামিন আন-নুবালা: ৬/৪০০]

❁ চার তারা

ছাত্রদের সাথে তাঁর ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিলো প্রচলিত ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের চেয়ে ভিন্ন। তিনি শুধু পড়াতেন আর ছাত্ররা কেবল শুনতো এমন না। কোনো গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা আসলে তিনি ছাত্রদেরকে নিয়ে সেটির সমাধান বের করেন। ছাত্রদেরকে সেভাবে তৈরি করেন যাতে তারা তাঁর সাথে ডিবেট করার সক্ষমতা অর্জন করে। ছাত্রদের সাথে বিতর্ক-আলোচনার পর তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছতেন।

তাঁর ক্লাস ছিলো উন্মুক্ত। ছাত্ররা চাইলে তাঁর মতের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে পারতো। তিনি সেটা সাদরে গ্রহণ করতেন। একবার তাঁর ক্লাসে এক নতুন শিক্ষার্থী বলে বসে, — “আবু হানিফা, আপনি ভুল বলছেন!”

নতুন ছাত্রের এমন স্পর্ধা দেখে পুরনো ছাত্ররা ক্ষেপে যায়। একজন রেগেমেগে সবাইকে বললো,

— “কোথাকার কোন ইঁচড়েপাকা এসে আমাদের ইমামকে যা-তা বলছে আর তোমরা সবাই চুপ করে আছো?”

ইমাম আবু হানিফা তাঁকে শান্ত করলেন। উত্তেজিত ছাত্রকে বুঝালেন,

— “আমিতো এখানে বসে আছি! আর আমি তো এজন্যই বসে আছি যাতে লোকেরা নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে আমার রায়কে ভুল প্রমাণ করুক আর আমি তা ধৈর্যের সাথে শুনি!” এমন সহনশীল ইমামের ছাত্ররাও সহনশীলতার শিক্ষা পায়। [আল-খায়রাত আল-হিসান, ইবনে হাজার আল-হায়তামী, পৃষ্ঠা ১৯৬]

তিনি নিজের মতকে কখনো অন্যের উপর চাপিয়ে দিতেন না। কোনো ফতোয়া দেবার পর তিনি বলতেন, “এটা আমাদের মত। আমাদের গবেষণা অনুযায়ী এই মতকে সর্বোত্তম মনে হয়েছে। কেউ যদি এরচেয়ে ভালো মত নিয়ে আসে তাহলে সে আমাদের চেয়ে বেশি সত্যের কাছাকাছি।”

ইমাম আবু হানিফার সমসাময়িক একজন ইমাম ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো ইমাম আল-আউযাঈ (রাহিমাহুল্লাহ)। আল-আউযাঈ তাঁর বিখ্যাত ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে

আল-মুবারককে (রাহিমাহুল্লাহ) ইমাম আবু হানিফার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, “কুফার ইমামের কাছ থেকে দূরে থাকবে। সে একজন বিদ'আতী।”

কিছুদিন পর আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ইমাম আল-আউযাঈকে কিছু কঠিন মাস'আলা দেখিয়ে বলেন, “এগুলো আমি কুফার একজন শায়খের কাছে গিয়ে শিখেছি।” মাস'আলাগুলো দেখে ইমাম আল-আউযাঈ মন্তব্য করেন, “বাহ! উনি তো বেশ জ্ঞানী। তুমি উনার কাছে গিয়ে শেখো।” এবার আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বললেন, “উনি সেই জ্ঞানী, যার কাছে যাবার জন্য আপনি নিষেধ করেছিলেন!”

ইমাম আল-আউযাঈ তাঁর ভুলটি বুঝতে পারেন। লোকমুখে শুনে তিনি ইমাম আবু হানিফাকে ‘বিদ'আতী’ বলে অভিহিত করেন। এই ভুলের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। পরবর্তীতে মক্কায় ইমাম আবু হানিফার সাথে তাঁর দেখা হয়। দুই ইমামের পাশে উপস্থিত ছিলেন দুজনেরই ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক। [আল-খায়রাত আল-হিসান, ইবনে হাজার আল-হায়তামী, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৭]

❀ ছয় ❀

ইমাম আবু হানিফার মা ছিলেন খুবই ধার্মিক। সুরালো ওয়াজিদের তিনি পছন্দ করতেন। কুফার সবচেয়ে জনপ্রিয় ওয়াজি ছিলেন আমরুদ বিন জারকা। ইমাম আবু হানিফার মা ছিলেন তাঁর ভক্ত। কোনো ফতোয়া জানার থাকলে তিনি আমরুদের কাছে লোক পাঠিয়ে জেনে নিতেন।

একবার ইমাম আবু হানিফার মায়ের একটা ফতোয়া জানার প্রয়োজন হলো। তাঁর কাপড়ে রক্ত লেগে আছে। এই কাপড় পরে কি তিনি মসজিদে যাবেন? ইমাম আবু হানিফা ফতোয়া দিলেন। কিন্তু, ইমাম আবু হানিফার ফতোয়া মায়ের পছন্দ হলো না। মা বললেন, “আমাকে আমরুদের কাছে নিয়ে যাও। আমি তাঁর

✽ চার তারা

কাছ থেকেই ফতোয়া জেনে আসবো।” মাকে খচ্চরের পিঠে বসিয়ে ইমাম আবু হানিফা লাগাম টেনে চললেন আমরুদের বাড়ির দিকে।

মজার ব্যাপার হলো, আমরুদ ছিলো ইমাম আবু হানিফার ছাত্র! আমরুদ নিজেই এই ফতোয়া জানতেন না। ইমাম আবু হানিফা তাঁকে ফতোয়া বলে দেন, আমরুদ সেই ফতোয়া ইমাম আবু হানিফার মাকে বললে তিনি এবার সন্তুষ্ট হলেন। মায়ের মনে আমরুদের প্রতি যে ভক্তি ছিলো, ইমাম আবু হানিফা সেটা ভাঙ্গেন নি। নিজের শান শওকতও বলে বেড়াননি, ‘আপনি যার কাছে ফতোয়া জানতে গেলেন, সেই লোকটি আমার ছাত্র’ এমনটাও বলেননি।

[আল-খায়রাত আল-হিসান, ইবনে হাজার আল-হায়তামী, পৃষ্ঠা ১৯৫-১৯৬]

কুর’আন তেলাওয়াত আর নফল ইবাদত করে তাঁর অবসর সময় কাটতো। সেই ইমাম আবু হানিফাকে কেউ যখন বলতো— “ইত্তাকিল্লাহ, আদ্বাহকে ভয় করো!” তাঁর জবাবে তিনি বলতেন, “জাজাকাল্লাহ, আপনার মতো মানুষই তো আমরা চাই যারা আমাদেরকে রিমাইভার দিবে!”

[সিয়ারু আ’লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী: ৬/৪০০]

তাঁর ফতোয়ার সাথে যারা দ্বিমত করতেন তারা পর্যন্ত তাঁর চরিত্র গুণে মুগ্ধ ছিলেন। জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রাহিমাহুল্লাহ) সুফিয়ান সাওরীকে (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, “আবু হানিফাকে আমি কোনোদিন কারো গীবত করতে শুনিনি!” সুফিয়ান সাওরী বলেন, “আবু হানিফা তো এতোটা বোকা না যে নিজের সব নেক আমলকে গীবত করে ধ্বংস করে দিবেন।”

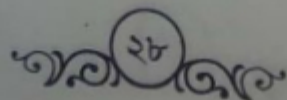
[তারিখ বাগদাদ, খতিব বাগদাদী: ১৩/৩৬১]

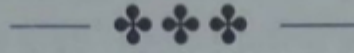
মন্দকে প্রতিহত করার জন্য ইমাম আবু হানিফা ভালোকে বেছে নেন।

পবিত্র কুর’আনে আদ্বাহ বলেন:

“তাদেরকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। কারণ, তারা ধৈর্যধারণ করে এবং ভালো দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে।”

[সূরা কাসাস-২৮:৫৪]





ইমাম আবু হানিফার এক প্রতিবেশী মুচি ছিলো। সে ছিলো মাদকাসক্ত। প্রতিরাতে তার বাড়িতে মদের আড্ডা বসতো। মাতাল হয়ে সবাই চিৎকার করতো। ইমাম আবু হানিফা তাঁদের চিৎকার-চেচামেচিতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারতেন না। একরাতে তিনি আর কোনো চিৎকার শুনতে পেলেন না। সকালে ঘুম থেকে উঠে জানতে চাইলেন লোকটির কী হয়েছে? তাঁকে বলা হলো, পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেছে। মানুষজন তার কাছে টাকা পায় কিন্তু সে টাকা দেয় না। ইমাম আবু হানিফা জেলে গেলেন। মুচির জামিন হয়ে তার সমস্ত ঋণ নিজে চুকিয়ে দিলেন। ইমাম আবু হানিফার এমন ব্যবহারে মুচি মুগ্ধ হয়ে আগের জীবন থেকে ফিরে আসলো। সে ইমাম আবু হানিফার ছাত্র হলো এবং পরবর্তীতে একজন যোগ্য ফকীহ হিশেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো।

[আল-খায়রাত আল-হিসান, ইবনে হাজার আল-হায়তামী, পৃষ্ঠা ১৯৩-১৯৪]

❀ সাত ❀

কুফা ছিলো শিয়াদের হোমল্যান্ড। কুফার কিছু কিছু কটর শিয়া উসমানকে (রা:) ইহুদি বলতো! ইমাম আবু হানিফা একদিন একজন কটর শিয়ার কাছে গেলেন যে উসমানকে (রা:) ইহুদি মনে করে। তার বাড়িতে গিয়ে ইমাম আবু হানিফা বললেন, “আপনার মেয়ের জন্য একটা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। পাত্র খুব ধার্মিক, ভদ্র, সম্পদশালী।” প্রস্তাবটি শুনে লোকটির মনে ধরলো। এর চেয়ে উত্তম প্রস্তাব আর কী হতে পারে? হাসিহাসি মুখে সে যখন তৃপ্তির ঢেঁকুর গিলছে, তখন ইমাম আবু হানিফা বললেন, “কিন্তু একটা সমস্যা।” ‘সমস্যা’ শব্দটি শুনার পর লোকটির মুখ ফ্যাকাসে হওয়া শুরু হলো।

❁ চার তারা

ইমাম আবু হানিফা বললেন, “পাত্র হলো ইহুদি!” লোকটির মেজাজ গরম হয়ে গেলো। রেগেমেগে বললো, “আপনি একটা ইহুদির সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাচ্ছেন?” ইমাম আবু হানিফা হাসলেন। ইমাম আবু হানিফার হাসি দেখে লোকটির কাঁটা গায়ে নুনের ছিটার মতো লাগলো। তিনি বললেন, “আপনারা যাকে ইহুদি বলে জানেন (অর্থাৎ উসমান রা.), তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের জামাই বানিয়েছেন। তাঁর সাথে নিজের দুজন মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। তাহলে আপনার আপত্তি কিসের?”

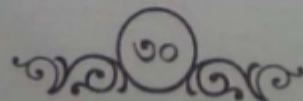
লোকটি এবার সংবিত্ত ফিরে পেলো। মনে মনে বললো, আসলেই তো। ইমাম আবু হানিফার যুক্তি শুনে লোকটি তওবা করলো।

কুফার আলেমগণের মধ্যে খুব কম সংখ্যক আলেম উসমানকে (রা:) প্রশংসা করতো। সাঈদ ইবনে আবি আউবা নামের একজন ছাত্র কুফায় এসে ইমাম আবু হানিফার ক্লাস করেন। ইমাম আবু হানিফার মুখে উসমানের (রা:) প্রশংসা শুনে সাঈদ বললেন, “আমি এই শহরের আর কাউকে উসমানের (রা:) প্রশংসা করতে শুনিনি!”

শিক্ষকের আসনে বসার পর চারিদিকে তাঁর সুনাম বাড়তে থাকে। নানান প্রান্ত থেকে লোকজন তাঁর কাছে আসতো ফতোয়ার জন্য।



একবার এক দম্পতি ইমাম আবু হানিফার সমসাময়িক বিখ্যাত ইমাম সুফিয়ান আস সাওরীর (রাহিমাহুল্লাহ) কাছে গেলো একটা ফতোয়া জানতে। তাদের কেইসটি ছিলো এমন- এক লোক রাগের মাথায় তার বউকে বললো, ‘আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না তুমি আমার সাথে আগে কথা বলো, আমি তোমার সাথে কথা বলবো না’। এই কথাটি শুনে স্ত্রীও একই কসম করলো। দুজনের রাগ যখন পানি হলো স্বামী তখন সুফিয়ান সাওরীর কাছে গিয়ে বললো, “আমাদের কি কাফফারা দিতে হবে?” সুফিয়ান সাওরী বললেন, “হ্যাঁ, কাফফারা দিতে হবে।” লোকটি হতাশ মনে বাড়ি ফিরতে উদ্যত হলো। হঠাৎ কী মনে করে সে আবু হানিফার কাছে গিয়ে ঘটনাটি বললো। ইমাম আবু হানিফা বললেন,



“কসমের কাফফারা দেওয়া লাগবে না! যাও বউয়ের সাথে গিয়ে কথা বলো।”

সুফিয়ান সাওরী যখন শুনতে পেলেন ইমাম আবু হানিফা এমন ফতোয়া দিয়েছেন তখন তিনি ইমাম আবু হানিফার কাছে ছুটে আসলেন। “আপনি মানুষকে এমন ভুল মাস’আলা দেন কেন?” ইমাম আবু হানিফা সুফিয়ান সাওরীকে বললেন, “শান্ত হোন। আমি লোকটিকে আবার ডেকে আনি। পুরো ঘটনা আবার শুনুন।” লোকটি আবার এসে দুই শ্রেষ্ঠ ইমামের কাছে পুরো কেইসটি আবার বললো।

ইমাম আবু হানিফা বললেন, “দেখুন, স্ত্রী যখন স্বামীকে উদ্দেশ্য করে ‘আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না তুমি আমার সাথে আগে কথা বলো, আমিও তোমার সাথে কথা বলবো না’ এটা বললো তখন স্ত্রী তো কথা বলেই ফেললো। স্বামীর শর্তও পূরণ হয়ে গেলো। এবার যদি স্বামী গিয়ে স্ত্রীর সাথে কথা বলে তাহলে তো দুজনের কাউকে কাফফারা দিতে হবে না।”

ইমাম আবু হানিফার বিশ্লেষণ শুনে সুফিয়ান আস সাওরী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন— “আপনার যে কথা যে সময়ের মধ্যে বুঝে আসে, আমাদের ধারণাও সেখানে পৌঁছাতে পারে না।”

যাদের সাথে মতের অমিল ছিলো তাদের ব্যাপারে আবু হানিফা কখনো কটু কথা বলতেন না। তিনি প্রায় সময় একটি দু’আ করতেন, “হে আল্লাহ! আমাদের দ্বারা যদি কেউ বিরক্ত হয়, আমাদের হৃদয়কে যেন তাঁদের জন্য উন্মুক্ত করে দিও।”

অর্থাৎ, যারা তাঁকে অপছন্দ করেন, তাঁর মনে যেন তাদের প্রতি ঘৃণাবোধ না জন্মায়।

❁ আট ❁

ইমাম আবু হানিফা দুটো ইসলামি খিলাফত দেখে যান। উমাইয়া খিলাফত এবং আব্বাসী খিলাফত। তাঁর জীবনের প্রথম বায়ান্ন বসন্ত কাটে উমাইয়া খিলাফতের অধীনে। শেষের আঠারো বছর কাটান আব্বাসী খিলাফতের অধীনে।

উমাইয়ার শাসনামলে ইবনে হুবাইরা নামের একজন লোক ছিলেন কুফার গভর্ণর। একবার তিনি ইমাম আবু হানিফাকে খিলাফতের একটি পদে নিয়োগ দিতে চাইলেন। ইমাম আবু হানিফার সমসাময়িক অনেক আলেমকে জোর করে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। ইমাম আবু হানিফাকে জোরাজুরি করলে তিনি পরিষ্কার বলে দেন, “তিনি যদি ‘ওয়াসিত’ মসজিদের দরজা গুণার দায়িত্ব আমাকে দেন, তবুও আমি তার দেওয়া দায়িত্ব নিতে আগ্রহী নই।”

[Abu Hanifah: His Life and Works, Shibli Nomani, page 50]

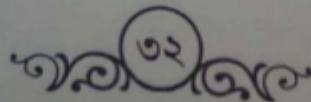
দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা দেখানোর জন্য তাঁকে মারধর করা হয় তবুও তিনি নতী স্বীকার করেননি। উমাইয়া খিলাফতের পতনের আগ পর্যন্ত তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। আব্বাসীদের আগমনকে আবু হানিফা স্বাগত জানান। আব্বাসী খলিফা আল মানসুরের সাথে প্রথমদিকে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।

একবার খলিফা আল মনসুর ইমাম আবু হানিফাকে তাঁর দরবারে ডাকলেন। আল মনসুর আর তাঁর স্ত্রীর মধ্যকার একটা ঝগড়ার মীমাংসার জন্য। মনসুরের স্ত্রী হুররা খাতুন দাবী করলেন তাঁর স্বামী তাঁর সাথে ন্যায় আচরণ করছেন না।

মনসুর ইমাম আবু হানিফাকে প্রশ্ন করলেন, “একজন পুরুষ কয়টি বিয়ে করতে পারে?”

— আবু হানিফা বললেন, চারটি।

— একজন পুরুষ কতজন দাসী রাখতে পারেন?



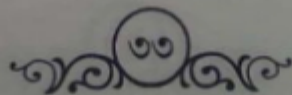
- তাঁর যতজন পছন্দ।
- এই ব্যাপারে কেউ কি তাঁকে বাধা দিতে পারবে?
- না।

আল মনসুর স্ত্রীকে বললেন, “শুনলে তো, ইমাম কী বলছেন?” আল মনসুর ভেবেছিলেন তিনি এই মামলায় জিতে গেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা বললেন, “তবে, আব্বাহ এটা তাদের জন্য অনুমতি দিয়েছেন যারা ন্যায় বিচার করতে পারে। আব্বাহ কুর’আনে বলেনঃ ‘যদি আশংকা করো যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা করতে পারবে না তাহলে এক স্ত্রীতেই তৃপ্ত থাকো’ [সূরা নিসা-৪:৩]

ইমাম আবু হানিফার শেষের রায় শুনে আল-মনসুর থ হয়ে গেলেন। আবু হানিফা উঠে বাড়িতে চলে গেলেন। বাড়ি যাবার পর দেখলেন এক লোক তাঁর জন্য এক ব্যাগ টাকা নিয়ে আসছে। ইমাম আবু হানিফা জিজ্ঞেস করলেন, “এগুলো কিসের টাকা?” তাঁকে বলা হলো, বেগম সাহেবা আপনার রায় শুনে খুশি হয়ে এগুলো দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, “আপনার বেগম সাহাবাকে গিয়ে বলবেন আমি যে ফতোয়া দিয়েছি সেটা আব্বাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, কোনো মানুষকে তুষ্ট করার জন্য না। আর এর বিনিময়ে আমি কোনো পারিশ্রমিক আশা করিনা।” লোকটি ব্যাগভর্তি টাকা নিয়ে ফিরে গেলো।

এক পর্যায়ে আব্বাসী খলিফার সাথে ইমাম আবু হানিফার সম্পর্কের অবনতি হয়। খলিফা আল মনসুর বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ইমাম আবু হানিফাকে কাছে ডেকে জনসমর্থন তৈরি করার চেষ্টা করেন। ইমাম আবু হানিফা প্রত্যেকবার সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেন।

শেষবার আল মনসুর ইমাম আবু হানিফাকে বাগদাদের ক্বাদি হবার প্রস্তাব দেন। বাগদাদের ছিলো তখনকার খিলাফতের রাজধানী। বাগদাদের ক্বাদি হওয়া মানে পুরো খিলাফতের প্রধান বিচারপতির আসনে বসা।



❁ চার তারা

ইমাম আবু হানিফা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, “আমি এই পদের যোগ্য না।” আল মনসুর রেগে বললেন, “আপনি মিথ্যা কথা বলছেন। আপনি এই পদের যোগ্য।” ইমাম আবু হানিফা এবার তাঁর পুরনো কৌশল কাজে লাগান। প্রতিপক্ষের যুক্তি দিয়ে তাঁকে ঘায়েল করা। তিনি বললেন, “এই তো, আমি যদি আপনার মতে মিথ্যাবাদী হই তাহলে তো আমি আসলেই এই পদের যোগ্য না আর আমি যদি আমার কথায় সত্যবাদী হই তাহলেও আমি এই পদের যোগ্য না!”

জীবনের গোধূলিবেলায় তিনি কারাবরণ করেন। কারাগারের মধ্যে ইন্তেকাল করেন। সত্তর বছরের গৌরবান্বিত জীবন কাটানোর পর ১৫০ হিজরীতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ফকীহ। যার সম্পর্কে ইমাম শাফে'ঈ বলেনঃ “আমরা ফিকহের বেলায় আবু হানিফার সন্তানতুল্য!”

তাঁর জানাজার নামাজ ছয়বার পড়া হয়। বাগদাদের একটি কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।



❖ ইমাম আবু হানিফার উক্তি সমাহারঃ

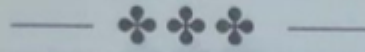
- কোনো ব্যক্তির জন্য আমাদের কথাকে গ্রহণ করা ততোক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে না জানে আমরা কোথেকে সেটি গ্রহণ করেছি।
- দ্বীনের জ্ঞান তোমার অন্তরে শিকড় গাড়তে পারবে না, যদি তুমি সেটা দুনিয়াবী স্বার্থে অর্জন করো।



❖ ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সম্পর্কে কিছু কণ্ডল :

১. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক একবার সুফিয়ান সাওরিকে বলেন, দেখেছেন আবু হানিফা গিবত থেকে কত দূরে ছিলেন? কখনো কোনো শত্রুর গিবত করেছেন বলেও শুনিনি। উত্তরে সাওরি বলেন, কসম আল্লাহর, নিজের নেক আমলকে নষ্ট করে দেয়— এমন কোনো কাজ করবার চেয়ে তিনি অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিলেন।

শারিক ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আবু হানিফা দীর্ঘ সময় চুপচাপ থাকতেন। ফিকহ ও বুদ্ধির প্রাচুর্য ছিল তাঁর। মানুষের সাথে বিতর্ক করতেন খুব কম; আলাপ-সালাপও খুব কম করতেন। (আল খাইরাতুল হিসান ফি মানাকিবি আবি হানিফাতান নু'মান, পৃ. ৪২, ইবনে হাজার হাইতামি, হিন্দুস্তানি সংস্করণ, ১৩২৪ হি.)

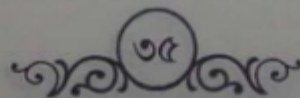


২. ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, আবু হানিফার কাছে কেউ কোনো প্রয়োজনের কথা বলামাত্র তিনি তা পূরণ করে দিতেন।

তাঁর ছেলে হাম্মাদ সুরা ফাতিহা পড়া শেষ করলে ছেলের উস্তাদকে তিনি পাঁচশো দিরহাম হাদিয়া দেন। অন্য বর্ণনামতে এক হাজার দিরহাম হাদিয়া দেন। (আল খাইরাতুল হিসান ফি মানাকিবি আবি হানিফাতান নু'মান, পৃ. ৪২, ইবনে হাজার হাইতামি, হিন্দুস্তানি সংস্করণ, ১৩২৪ হি.)



৩. এক ব্যক্তি ইয়াযিদ ইবনে হারুনকে জিজ্ঞাসা করল, আবু খালেদ, ইমাম মালেকের ফিকহ আপনার কাছে অধিক প্রিয় না ইমাম আবু হানিফার ফিকহ? ইয়াযিদ উত্তর দিলেন, তুমি ইমাম মালেকের হাদিস লেখো। কারণ, তিনি রাবি যাচাই-বাছাই করেন। ফিকহ হলো ইমাম আবু হানিফার কাজ। ফিকহের কোনো মাসয়ালায় মুনাযারা করে কেউ আবু হানিফার ওপর বিজয় লাভ করতে

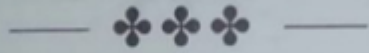


❀ চার তারা

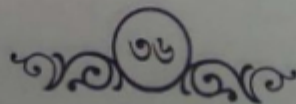
পেরেছে, এমন কাউকে আমি দেখিনি। ফিকহ হলো আবু হানিফা ও তাঁর ছাত্রদের শাস্ত্র। তাদের সৃষ্টিই যেন ফিকহের জন্য। (মানাকিবু আবি হানিফা পৃ. ৩২২, মুয়াওয়াফফাক মাক্কি, দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৪০১ হি.)



৪. হারমালা ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, আমি ইমাম শাফেয়িকে বলতে শুনেছি—যে আবু হানিফার কিতাব পড়বে না, সে ফিকহে ব্যাপ্তি অর্জন করতে পারবে না। (মানাকিবু আবি হানিফা পৃ. ৩২২, মুয়াওয়াফফাক মাক্কি,) ইমাম শাফেয়ি আরও বলেন, মানুষ ফিকহের ক্ষেত্রে আবু হানিফার ওপর নির্ভরশীল। (মানাকিবু আবি হানিফাহ ওয়া সাহিবাইহি পৃ. ৩০, ইমাম যাহাবি)



৫. ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল কাত্তান বলেন, আমরা আব্দুল্লাহর সাথে মিথ্যা বলব না। আবু হানিফার ফিকহের চেয়ে সুন্দর ফিকহের কথা আমরা শুনিনি। এবং তাঁর অধিকাংশ ফিকহই আমরা গ্রহণ করেছি। (মানাকিবু আবি হানিফাহ ওয়া সাহিবাইহি পৃ. ৩২, ইমাম যাহাবি, লাজনাতু ইহইয়াইল মাআরিফিন নুমানিয়াহ, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৮ হি.)





ইমাম মালিক

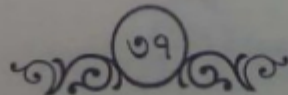
শিখরদেহী শিকড়

✽ এক ✽

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সাহাবীদের মধ্যে আবু হুরাইরার (রা:) পর সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেন আনাস ইবনে মালিক (রা:)। আনাসের (রা:) বয়স যখন দশ বছর তখন থেকে তিনি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেবায় নিয়োজিত হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনাসের (রা:) জন্য দু'আ করেন। আল্লাহ তাঁর সন্তানসন্ততি এবং হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেন। সর্বশেষ ইন্তেকাল করা সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

[* ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) দেখতে বেশ লম্বা ছিলেন। এজন্য শিখরদেহী শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে তাঁর রচিত 'মুয়াত্তা' কিতাবটি হাদীশ শাস্ত্রের প্রথম রচিত কিতাব। এই কিতাবের মধ্য দিয়েই লিখিত আকারে হাদীস চর্চার সূচনা হয়। সেই হিশেবে শিকড়।]

আনাস ইবনে মালিক (রা:) ইন্তেকাল করেন ৯৩ হিজরীতে। একই বছর জন্মগ্রহণ করেন তাঁর নামের মতো আরেকজন। তবে, উল্টো নাম। তাঁর নাম মালিক



❁ চার তারা

ইবনে আনাস (রাহিমাহুদ্বাহ)। পৃথিবীবাসী যাকে চিনে 'ইমাম মালিক' নামে।

রাসূলুদ্বাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

“অচিরেই মানুষ উটে চড়ে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে দুনিয়া ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু তারা মদীনার আলেম অপেক্ষা বিজ্ঞ আলেম খুঁজে পাবে না।” [জামে আত-তিরমিজি: ২৬৮০]

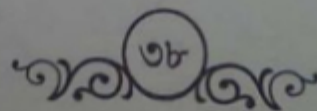
ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুদ্বাহ), সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাসহ (রাহিমাহুদ্বাহ) অনেক মুহাদ্দিস বলেন, হাদীসটিতে রাসূলুদ্বাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমাম মালিকের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।

❁ দুই ❁

মালিক ইবনে আনাস নবীর শহর মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তাঁর পরিবারের সুখ্যাতি আছে। তাঁর দাদা মালিক ইবনে আবি আমের ছিলেন সাহাবীদের ছাত্র। তাঁর এক চাচা ছিলেন প্রখ্যাত তাবেরি ইবনু শিহাব আয যুহরির (রাহিমাহুদ্বাহ) শিক্ষক।

মদীনার অন্য সকল বাচ্চাদের মতো ছোটবেলায় মালিক কুর'আন মুখস্ত করেন। আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁর তেমন ঝোঁক ছিলো না। তাঁর শখ ছিলো কবুতর পোষা। কবুতরগুলোর সেবায়ত্ন করে তাঁর দিন কাটতো।

একদিন খেতে বসে মালিকের বাবা তাঁকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। মালিক প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। এবার তাঁর বাবা তাঁর এক ভাইকে প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করলেন। মালিকের ভাই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন। বাবা তাঁকে একটু খোঁচা দিলেন— “এই কবুতরগুলোই তোমার জ্ঞানার্জনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।”



বাবার কথা শুনে তাঁর রাগ হলো। সবার সামনে এমন লজ্জা? তার উপর সবাই তাঁকে ডাকে তাঁর ভাইয়ের পরিচয়ে— ‘নদরের ভাই মালিক’। এবার তো নিজের একটা পরিচয় দরকার। মালিক ঠিক করলেন, নাহ, এবার আমাকে জ্ঞানার্জনে মনোযোগী হতে হবে।

অন্যদিকে মনে মনে তিনি আরেকটা ইচ্ছাও পোষণ করতেন। গায়ক হওয়া। মনের ইচ্ছার কথা মাকে বলতেন— “মা, আমি গায়ক হবো!”

মালিকের মা আলিয়া বিনতে শারিক বেশ বুদ্ধিমতী। ছেলের গায়ক হবার ভূত মাথা থেকে দূর করার জন্য তিনি ছেলেকে আদর করে বলতেন, “দেখো বাবা, গায়ক হতে হলে শুধু সুরেলা কণ্ঠস্বর থাকলেই হবে না, দেখতেও সুশ্রী হতে হবে। তোমাকে দেখতে তো কোনোভাবেই গায়ক মনে হয় না।” মায়ের অনুৎসাহে তাঁর গায়ক হবার সাধ মিটে যায়।

আলিয়া বিনতে শারিক তাঁর ছেলের জন্য আলেমদের জামা-পাগড়ি নিয়ে আসতেন। সেগুলো পরিয়ে তিনি ছেলের কাছে সহজ সহজ প্রশ্ন জানতে চাইতেন— “বলতো বাবা যুহরের নামাজ কয় রাকআত?” মালিক নিজেকে সত্যি সত্যি আলেম ভেবে আলেমের মতো করে বলতেন— “বারো রাকআত।”

সত্যিকারের আলেম হতে হলে কার কাছে গিয়ে পড়তে হবে এটা তো মালিকের জানা ছিলো না। তাঁর মা তাঁকে বলে দিতেন— “রাবী আর-রাঈ নামের একজনের কাছে যাও। ইলম শেখার আগে তাঁর আদব শিখবে।”

মায়ের পরামর্শে মালিক ইবনে আনাস রাবিয়াকে তাঁর প্রথম শিক্ষক হিসেবে বেছে নেন। রাবিয়ার আদব শেখার পর মালিক ইবনে হরমুজের কাছে হাদীস শিখতে যান। ইবনে হরমুজ ছিলেন অন্ধ। মালিক প্রতিদিন ভোরে হরমুজের বাড়ি যেতেন এবং ফিরতেন রাতের বেলা।

হরমুজের বাড়িতে আরো অনেকেই হাদীস শিখতে যেতেন। বেশি মানুষ গেলে মালিকের ভাগে কম সময় পড়তো। মালিকের মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। তিনি হরমুজের বাড়ি যাবার সময় পকেটে করে কিছু খেজুর নিয়ে যেতেন। হরমুজের

❁ চার তারা

ছোটো বাচ্চাদেরকে খেজুর দিয়ে বলতেন, “কেউ যদি তোমাদের বাবার কাছে আসে, তোমরা বলবে তিনি ব্যস্ত।” বুদ্ধিটা কাজে লাগে। মালিক নিশ্চিন্তে হরমুজের কাছে ঘন্টার পর ঘন্টা হাদীস-ফিকহ শিখতে পারতেন।

হরমুজের কাছে মালিক সাত বছর কাটান। এরপর শিক্ষক হিশেবে বেছে নেন উমরের (রা:) পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের (রা:) আজাদকৃত দাস নাফে'কে।

নাফে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের (রা:) সাথে ত্রিশ বছর কাটান। এই ত্রিশ বছর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের (রা:) সাথে ছায়াসঙ্গী হিশেবে থাকেন। তাঁর কাছ থেকে রাসূলের (সাঃআঃ) আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস এবং ফিকহ শিখেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) থেকে রাসূলের ইলমের যে ধারা প্রবাহিত হয়েছে তাঁর প্রধান ধারক ছিলেন নাফে।

মালিক নাফেকে শিক্ষক হিশেবে বেছে নিয়েছেন ঠিক, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে শিখবেন কিভাবে? আব্দুল্লাহ একেকজন মানুষকে একেক রকম মেজাজ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কারো মেজাজ আবু বকরের মতো কোমল, কারো মেজাজ উমরের মতো কঠোর। উমরের পরিবারে বেড়ে উঠা নাফের মেজাজও ছিলো একটু কঠোর। তাঁর কাছে ঘেঁষতে অনেকে ভয় পায়।

মালিক এক্ষেত্রেও একটা বুদ্ধি আঁটেন। মধ্য দুপুরে সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে তখন তিনি নাফের বাড়ির সামনে গিয়ে তাঁর অপেক্ষা করতেন। কড়া রোদের মধ্যে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। আশেপাশে কোনো গাছ ছিলো না যেখানে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেবেন।

যখনই মসজিদে যাবার জন্য নাফে বের হতেন তখন মালিক তাঁর সাথে সাথে ছুটতেন। এমন ভাব করতেন যেন আকস্মিক তাঁর সাথে দেখা হয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে নাফেকে জিজ্ঞেস করতেন, “এই ব্যাপারে ইবনে উমর কী ফতোয়া দিতেন?” নাফে সেগুলোর উত্তর দিতেন।

ব্যক্তিগতভাবে নাফের কাছে শেখার পাশাপাশি মসজিদে নববীতে নাফের দরসেও মালিক অংশগ্রহণ করেন।

নাফে ইস্তেকাল করেন ১১৮ হিজরীতে। মালিক বারো বছর নাফের ক্লাস করার সুযোগ পান। এই বারো বছরে তিনি ইবনে উমরের (রা:) ফিকহ আত্মস্তু করেন।

রাবিয়া, হরমুজ আর নাফের পাশাপাশি মালিকের আরেকজন শিক্ষক ছিলেন ইবনু শিহাব আয যুহরি। হাদীস মুখস্ত করার ক্ষেত্রে তিনি বেশ পারদর্শী। এক ক্লাসে তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদেরকে চল্লিশটি হাদীস শেখান। পরদিন শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করেন, “গতকাল আমি যেসব হাদীস শিখিয়েছিলাম সেগুলো থেকে কে আমাকে একটি হাদীস শুনাতে পারবে?” ইবনু শিহাব আয যুহরির সাথে মালিকের প্রথম শিক্ষক রাবিয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি শিহাবকে বললেন, “এখানে একজন ছাত্র আছে যে আপনার গতকালকের সবগুলো হাদীস শুনাতে পারবে।” শিহাব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কে সে?” রাবিয়া মালিককে বললেন, “শুনাও।”

মালিক ইবনু শিহাব আয যুহরির গত ক্লাসের শেখানো চল্লিশটি হাদীস এক নাগারে বলে যেতে লাগলেন। মালিকের প্রতিভা দেখে ইবনু শিহাব আয যুহরি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। তিনি ভাবতেন এই ধরনের প্রতিভা তাঁর ছাড়া আর কারো নেই। মালিককে দেখে তাঁর ভুল ভাঙ্গে।

আরেকদিন ঈদের নামাজ পড়ে মালিক ছুটলেন ইবনু শিহাব আয যুহরির বাড়ি। তিনি ভাবলেন ঈদের দিন নিশ্চয় তিনি ফ্রি থাকবেন।

মালিককে দেখতে পেয়ে শিহাব বললেন, “তুমি ঈদের নামাজ পড়ে মনে হয় বাড়ি যাওনি।” মালিক বললেন, “না, বাড়ি যাইনি।”

— “তারমানে তুমি এখনো কিছু খাওনি, তাইনা?”

— “না, খাইনি।”

— “তাহলে বসো, খাওয়াদাওয়া করো।”

— “আমি খাবার জন্য আসি নি।”

— “তাহলে?”

❀ চার তারা

— “আমি হাদীস শেখার জন্য এসেছি!”

ইবনু শিহাব আয যুহরি ভীষণ অবাক হলেন। তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। — “এমনকি ঈদের দিনেও!”

মালিক হেসে বললেন, “হাদীস শেখাই তো আমার ঈদ!”

ঈদের দিন ইবনু শিহাব আয যুহরি মালিককে চল্লিশটি হাদীস শেখান। মালিক চল্লিশটি হাদীসে সন্তুষ্ট না। তিনি আরো শিখতে চান। ইবনু শিহাব আয যুহরি বললেন, “এই চল্লিশটি হাদীস যদি তুমি মুখস্ত করতে পারো তাহলে তুমি একজন হাফিজ।”

মালিক একবার শুনেই চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত করে ফেলেন। শিহাবকে আবারো অবাক করে দিয়ে মালিক বললেন, “আমি তো ইতোমধ্যে এগুলো মুখস্ত করে ফেলছি!” ইবনু শিহাব আয যুহরি মালিককে পরীক্ষা করতে চাইলেন। “দেখি বলো তো।” মালিক ইবনে আনাস সনদ-মতনসহ চল্লিশটি হাদীস শিহাবকে শুনাতে তিনি বললেন, “উঠো, তুমি হলে একজন জ্ঞান-পাত্র।”

মালিকের একজন শিক্ষিকা ছিলেন আমরাহ বিনতে আব্দুর রহমান (রাহিমাহুল্লাহ)। তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন আযিশার (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ছাত্র। ইসলামের পঞ্চম খলিফা হিশেবে পরিচিত উমর ইবনে আব্দুল আজিজের (রাহিমাহুল্লাহ) সময় ইবনু শিহাব আয যুহরি যখন হাদীস সংকল শুরু করেন, তখন উমর ইবনে আব্দুল আজিজ বলেন, “যাও, সবার আগে আমরাহ’র হাদীস সংগ্রহ করো।”

❀ তিন ❀

মালিকের শিক্ষক নাফে ইস্তেকাল করলে তিনি তাঁর আসন অলংকৃত করেন। ইতোমধ্যে সত্তরজন আলেম তাঁকে ফতোয়া দেবার অনুমতি দিয়েছেন।

শিক্ষকের আসনে বসলেও দূর থেকে দেখলে মনে হতো একজন রাজা বসে আছেন। তাঁর ক্লাসে আরামদায়ক বিছানা আর দামী দামী কার্পেট বিছানো থাকতো। হাদীসের ক্লাসে সুগন্ধী আগর কাঠ আর লোবানের ধোঁয়ায় চারিপাশ মৌ মৌ করতো।

ইমাম মালিক গোসল করে, দামী কাপড় পরে, সুন্দরভাবে চুল আঁচড়ে, গায়ে সুগন্ধী মেখে এমনভাবে ক্লাসে আসতেন যেমনভাবে রাজা তাঁর আসনে বসেন।

ক্লাসের মধ্যে পিনপতন নিরবতা বিরাজ করতো। শব্দ হবার ভয়ে ছাত্ররা বইয়ের পাতা উল্টাতে সাহস পেতো না। ইমামের ব্যক্তিত্বকে সবাই সমীহ করতো।

ইমাম মালিক যেখানে-সেখানে যেকোনো অবস্থায় হাদীস বর্ণনা করতেন না। হাদীস বর্ণনার সময় তিনি নির্দিষ্ট আচরণ বিধি মেনে চলতেন। তাড়াহুড়োর মধ্যে, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তিনি হাদীস বলতেন না। হাদীস বর্ণনা করার আগে তিনি ওজু করতেন, সুন্দর পোশাক পরতেন এবং সুগন্ধী ব্যবহার করতেন।

একবার ক্লাস শেষ হলে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তাঁর এক ছাত্র তাঁকে একটা হাদীস জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাঁর দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন। তাঁকে বললেন, “তোমাকে আমি ভালো ছাত্র মনে করতাম, কিন্তু আজ থেকে আর না!”

মাঝেমাঝে ছাত্ররা তাঁর বাসায় যেতো। ইমাম মালিক তাঁর দাসীকে বলতেন, “যাও দেখে আসো তো, তারা হাদীস শুনতে এসেছে নাকি কোনো প্রশ্ন নিয়ে এসেছে।” দাসী যদি এসে বলে তারা প্রশ্ন নিয়ে এসেছে তাহলে তিনি যে পোশাকে আছেন সেই পোশাকে ছাত্রদের সামনে যেতেন। আর দাসী যদি বলে, তারা হাদীস শিখতে এসেছে তাহলে তিনি ওজু করে, সুগন্ধী মেখে পরিপাটি হয়ে তাদের সামনে যেতেন। ঘরের মধ্যে ঘৃতকুমারী গাছের ছাল পুড়াতেন যাতে করে পুরো ঘরটা সুগন্ধে মুখরিত হয়।

ইমাম মালিকের উল্লেখযোগ্য একটা বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যা জানতেন না তা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতেন— ‘আমি জানি না’। কোনো প্রকার ভণিতা করতেন না, লোকে কী বলবে এই চিন্তায় ভুল উত্তর দিতেন না।

❁ চার তারা

একবার মরক্কো থেকে এক লোক দীর্ঘ ছয় মাস সফর করে তাঁর কাছে চত্বিশটি প্রশ্ন নিয়ে আসলো। তিনি চারটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে বললেন, “লা আদরী- আমি জানি না।” লোকটি বেশ অবাক হলো। এতো দূর থেকে সে আসলো, এখন কি খালি হাতে ফিরে যাবে? ইমাম মালিককে অনুরোধ করে বললো, “দেখুন, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, আপনি যদি উত্তর না দেন তাহলে যারা আমাকে পাঠিয়েছে তাদেরকে গিয়ে কী বলবো?” ইমাম মালিক সোজাসাপটা বলে দিলেন, “তাদেরকে গিয়ে বলবেন, আমি এগুলোর উত্তর জানি না।”

❁ চার ❁

ইমাম মালিকের ক্লাস করতে পারাটাকে মানুষজন বিরাট সৌভাগ্য মনে করতো। হিশাম ইবনে আম্মার নামের দামেস্কের এক ছাত্রের বাবা সমস্ত সম্পদ বিক্রি করেন ছেলেকে ইমাম মালিকের ক্লাসে পাঠানোর জন্য। ছেলে ইমাম মালিকের ক্লাসে এসেই বললো— “আমাকে হাদীস শিখান”। নতুন ছাত্রের অসৌজন্যমূলক আচরণ দেখে ইমাম মালিকের অগোচরে তাঁর পুরনো এক ছাত্র হিশামকে কয়েকটা ঘুষি মারলো।

ক্লাস শেষ হলে হিশাম ইবনে আম্মার ইমাম মালিকের কাছে ছুটে গিয়ে পুরো ঘটনা বললেন। ইমাম মালিক ব্যাখিত মনে বললেন, “বলো বাবা, আমি এখন কিভাবে এই ক্ষতিপূরণ করতে পারি?” সুযোগ পেয়ে হিশাম বললেন, “আপনার ছাত্রটি আমাকে যতোটা ঘুষি মেরেছে, আপনি আমাকে ততোটি হাদীস শেখাবেন।” কী দারুণ প্রস্তাব! ইমাম মালিক হেসে বললেন, “তোমাকে কয়টা ঘুষি মেরেছে?” হিশাম বললেন, “পনেরোটি।” ইমাম মালিক হিশামকে এক বসায় পনেরোটি হাদীস শেখান।

আরেকবার মদীনায় একটা হাতি আসলো। লোকেরা ছুটে গেলো হাতি দেখতে। মদীনার অনেক লোক জীবনে কোনোদিন হাতি দেখেনি। সবাই যখন হাতি

দেখতে চলে গেছে তখন ক্লাসের এক কোণায় একজন ছাত্র বসে রইলেন। পুরো ক্লাসের মধ্যে তিনি আর তাঁর ঐ ছাত্র। ছাত্রের নাম ছিলো ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া মাসমুদি (আন্দালুসের বিখ্যাত ইমাম)। ইমাম মালিক তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, “সবাই হাতি দেখতে গেলো, তুমি বসে রইলে কেন?”

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া মাসমুদি জবাব দিলেন, “আমি সুদূর মিসর থেকে এসেছি আপনার কাছ থেকে হাদীস শিখতে। আমি তো হাতি দেখতে আসিনি!”

✱ পাঁচ ✱

একবার খলিফা হারুন-অর-রশীদ জুমার খুতবার সময় মসজিদে একটা রাজকীয় চেয়ার নিয়ে ঢুকেন। চেয়ারে বসে খতিবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইমাম মালিক মিম্বরে উঠার সময় খলিফার উদ্ধত আচরণ খেয়াল করলেন। মিম্বরে উঠে একটা হাদীস বলে খুতবা শেষ করেন।

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এক স্তর বিনয়ী হবে (এই বলে রাসূলুল্লাহ হাত নিচে নামালেন), আল্লাহ তাঁর মর্যাদা এক স্তর উঁচু করবেন (এই বলে রাসূলুল্লাহ হাতে উঁচু করলেন)।” [মুসনাদে আহমাদ: ৩০৯]

এক হাদীসের এমন খুতবা শুনে খলিফা মসজিদ থেকে চেয়ার সরিয়ে নেন। তারপর ইমাম মালিক আবার খুতবা শুরু করেন।

খলিফা মাহদী এবং খলিফা হারুন আর-রশীদ দুজনই ইমাম মালিককে অনুরোধ করেন রাজদরবারে গিয়ে হাদীস শুনাতে। ইমাম মালিক খলিফাদ্বয়ের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন— “জ্ঞানের কাছে মানুষ আসে, মানুষের কাছে জ্ঞান যায় না।”

❁ চার তারা

খলিফার ছেলেদেরকে হাদীস পড়ানোর জন্য ইমাম মালিককে রাজ দরবারে যেতে বলা হয়। তিনি সেই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, “ব্যক্তি স্বার্থের জন্য সমষ্টির স্বার্থকে খুন করা যায় না। উম্মতের সকল ছেলেরা যেখানে বসে হাদীস শিখে, খলিফার ছেলেরাও সেখানে বসে হাদীস শিখবে। তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হবে না।” ইমামের ব্যক্তিত্বের কাছে খলিফা হার মানেন।

ইমাম মালিকের সময় খলিফা কাবার পুনর্নির্মাণ করতে চাইলেন। এর আগেও কয়েকজন খলিফা কাবার পুনর্নির্মাণ করেছেন। কাবার আকার বদলে দিয়েছেন। ইমাম মালিকের কাছে জানতে চাওয়া হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে কাবার আকার চেয়েছিলেন এভাবে কি নির্মাণ করবো? ইমাম মালিক বুঝতে পারলেন কাবাকে এভাবে খলিফাদের খেলনার পুতুল বানানো যাবে না। তিনি আপাত দৃষ্টিতে সুপ্রস্তাব মনে হওয়া প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, “আমি চাই না পবিত্র কাবা খলিফাদের খেলনার পুতুল হোক।”

তিনি মাঝেমাঝে রাজদরবারে যেতেন। কেউ কেউ এজন্য তাঁর সমালোচনা করতো। সমালোচনার জবাবে তিনি বলতেন, “আমি রাজদরবারে যাই ঠিকই, কিন্তু অর্থকড়ির জন্য না। আমি যাই তাদেরকে দ্বীনের উপদেশ দিতে।”

তিনি প্রায়ই বলতেন, “একজন মুসলিম, যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন, তাঁর কর্তব্য হলো শাসকদের কাছে গিয়ে নির্ভয়ে সত্য-মিথ্যা তুলে ধরা। এতে করে মানুষের কাছে আলেমদের মাকাম পরিস্কার হবে।”

ইমাম মালিকের জীবদ্দশায় চৌদ্দ-পনেরোজন খলিফা পালাক্রমে আসেন। অনেকের সাথে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিলো। তাই বলে তিনি খলিফাদের তোষামোদ করতেন না। আত্মসম্মান বজায় রেখে চলতেন। যার ফলে খলিফাগণ তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতেন।

একবার খলিফা মাহদী তাঁকে রাজদরবারে দাওয়াত দেন। তাঁকে পান করার জন্য রূপার গ্লাসে পানি দেওয়া হয়। তিনি পানি না খেয়েই রাজদরবার থেকে বের হয়ে যান। তাঁকে বের হতে দেখে খলিফা পিছু নেন। ‘কী হয়েছে জিজ্ঞেস?’ করলে বলেন, “আপনি জানেন না, রূপার পাত্রে পানি খাওয়া হারাম?”

এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিলো রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবী হুজাইফার (রাতিয়াল্লাহু আনহু) সাথেও।

“একবার তিনি মাদাইনে যান। সেখানে গিয়ে পানি চাইলে তাঁকে রূপার একটি পাত্রে পানি দেওয়া হয়। তিনি বারবার বলেছিলেন, আমাকে এমন পাত্রে পানি দিওনা, কিন্তু তারা তাঁর কথা শুনেনি। ফলে তিনি পানির পাত্রটি ছুঁড়ে ফেলে দেন।” [সহীহ বুখারী: ৫৮৩১]

❀ ছয় ❀

ইমাম মালিকের শ্রেষ্ঠ অবদান ‘মুয়াত্তা’। মুয়াত্তা ছিলো সংকলিত প্রথম হাদীসের কিতাব। ইমাম বুখারীর ‘সহীহ বুখারী’র আগ পর্যন্ত এই কিতাবটি ছিলো মুসলমানদের কাছে কুর’আনের পর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব। প্রায় একলক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে ইমাম মালিক ১৮৬১টি হাদীস মুয়াত্তায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

হাদীস শাস্ত্রের স্বর্ণসূত্র বলা হয়ঃ— রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর — নাফে — ইমাম মালিক। মুয়াত্তা কিতাবে ইমাম মালিক এই সূত্রে আশিটি হাদীস বর্ণনা করেন ইমাম মালিক।

‘মুয়াত্তা’ কিতাবটি ছিলো চার মাজহাবের প্রাথমিক সিলেবাস। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী ছিলেন হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত ফকীহ। তিনি ইমাম মালিকের কাছে মুয়াত্তা নোট করেন। ইমাম আশ-শাফে’ঈ মুয়াত্তা মুখস্ত করে ইমাম মালিকের সাথে প্রথম দেখায় মুয়াত্তা শুনান। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল মুয়াত্তা শিখেন ইমাম আশ-শাফে’ঈর কাছে।

তাঁর সময়ে আরো আশিজন ‘মুয়াত্তা’ নামে কিতাব লিখেন। তাঁকে কেউ কেউ পরামর্শ দিলো— আপনি অন্যগুলোর ব্যাপারে সমালোচনা করুন না কেন?

❁ চার তারা

ইমাম মালিক জবাব দিলেন— যে মুয়াত্তা শুধুমাত্র আব্দুল্লাহর সম্ভাটির জন্য রচিত, সেটি থেকে যাবে।

ইমাম মালিকের মুয়াত্তা তাঁর সময়েই জনপ্রিয়তা লাভ করে। খলিফা হারুন-অর-রশিদ ইমাম মালিককে প্রস্তাব দিলেন, “মুয়াত্তা কিতাবটি কাবা ঘরে ঝুলিয়ে রাখি?” এটার মানে হলো মুয়াত্তা কিতাবকে অফিশিয়াল হাদীসের কিতাব হিসেবে অনুমোদন করা। এমন ‘সম্মানজনক’ প্রস্তাবে ইমাম মালিক সম্মতি দিলেন না। এতে করে পরবর্তীতে অন্য কোনো হাদীস সংগ্রাহকের সংগ্রহকে মূল্যায়ন করা হবে না, মুয়াত্তার সাথে মিল নেই বলে তিরস্কারও করা হতে পারে। খলিফার প্রস্তাবে ‘না’ বলে ইমাম মালিক পরবর্তী হাদীস সংগ্রাহকের পথকে উন্মুক্ত করে দেন।

তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইমাম আশ-শাফে'ঈ ‘মুয়াত্তা’ নিয়ে মন্তব্য করেন, “পৃথিবীর বুকে কুর'আনের পর মুয়াত্তার চেয়ে সহীহ আর কোনো কিতাব নেই।”

[বিদ্র: তখন পর্যন্ত সিহাহ সিত্তাহর গ্রন্থগুলো সংকলিত হয়নি]

ইমাম মালিকের মেয়ে ফাতিমা ‘মুয়াত্তা’ মুখস্ত করেন। ইমাম শাফে'ঈর মেয়েও ‘মুয়াত্তা’ মুখস্ত করেন।

❁ সাত ❁

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহর প্রতি তাঁর বোঝাপড়া ছিলো ব্যতিক্রম। তিনি বলতেন, “সুন্নাহ হলো নূহের (আলাইহিস সালাম) নৌকার মতো। যে নৌকায় উঠলো সে নিরাপদ, যে নৌকায় উঠলো না সে বিপদে পড়লো।”

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভালোবাসা তাঁর অন্তরে এমনভাবে জায়গা করে নিয়েছিলো যে তিনি প্রতি পদে পদে তাঁর সুন্নাহ অনুসরণের ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন।

একমাত্র হজ্জ করা ছাড়া তিনি কখনো রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শহর মদীনা ছেড়ে বের হননি। গোয়ালঘরে বাহন থাকা স্বত্বেও তিনি মদীনায় কখনো বাহনের পিঠে চড়েননি। তিনি বলতেন, “যে শহরে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পদচিহ্ন লেগেছে সে শহরে আমি কিভাবে বাহনে চড়ি?”

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রওজার পাশে বসে তিনি ক্লাস নিতেন। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের দিকে আঙ্গুল তুলে বলতেন। “প্রত্যেকের কথা হয় গ্রহণ করা হবে অথবা বর্জন করা হবে, শুধুমাত্র এই কবরে যিনি শায়িত আছেন তাঁর কথা ছাড়া।”

✽ আট ✽

জীবনের শেষ বেলায় খলিফাদের সাথে ইমাম মালিকের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। খলিফা আবু জাফর আল-মানসুরকে বাইয়াত দেওয়া হবে কি-না এই নিয়ে লোকজন তাঁর কাছে জানতে আসলো। তিনি জবাবে একটু ঘুরিয়ে বলেন, “জোরপূর্বক তালাক গ্রহণযোগ্য না।” তৎকালীন মদীনার গভর্নর জাফর ইবনে সুলাইমান বুঝতে পারে, ইমাম মালিক বলতে চাচ্ছেন, জোরপূর্বক তালাক যেমন গ্রহণযোগ্য না, তেমনি জোরপূর্বক বাইয়াতও গ্রহণযোগ্য না।

তাঁর এই ফতোয়াকে কেন্দ্র করে তাঁকে বেত্রাঘাত করা হয়। তখন তিনি বৃদ্ধ। জীবনের শেষ দিনগুলো কাটে ভীষণ কষ্টে। এমনকি মসজিদে পর্যন্ত যেতে পারতেন না।

তিনি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শহর থেকে বের হতেন না। ইন্তেকালও করেন রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শহরে। যিনি সারাজীবন রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করেছেন, তিনি হয়তোবা চেয়েছেন

❁ চার তারা

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে শহরে শায়িত সেই শহরে শায়িত হতে।

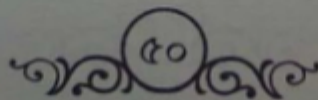
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “কেউ মদীনাতে মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম হলে সে যেন সেখানেই মৃত্যুবরণ করে। কারন, যে ব্যক্তি সেখানে (মদীনায়ে) মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্য শাফায়াত করবো।” [জামে আত-তিরমিজিঃ ৩৯১৭]

১৭৯ হিজরীতে কালিমা পাঠ করতে করতে উম্মতের এ কাণ্ডারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁর শিক্ষক নাকের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।



❖ ইমাম মালিকের উক্তি সমাহারঃ

- অনেক বেশি বর্ণনা করাই জ্ঞান নয়। জ্ঞান হলো এক নূর যা আল্লাহ হৃদয়ে স্থাপন করেছেন।
- মানুষ যখন নিজের প্রশংসা শুরু করে, তার সম্মান তখন তার থেকে দূরে চলে যায়।
- জ্ঞান শেখার আগে সদাচরণ শেখো।
- সুন্নাত হলো নূহের নোকার মতো। যে নৌকায় উঠলো সে নিরাপদ, যে উঠলো না সে পানিতে ডুবে গেলো।

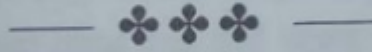


❖ ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ. -এর সম্পর্কে কিছু কণ্ডল —

১. আলি ইবনুল মাদিনি রহ. বলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. বলতেন —
আব্বাহ ইমাম মালেকের প্রতি রহম করুন। কত কঠিনভাবেই না তিনি রাবিদের
যাচাই-বাছাই করেছেন! (আল-ইনতিকা ফি ফাযাইলিল আইম্মাতিস সালাসাতিল
ফুকাহা, পৃ. ৫২, হাফেয ইবনে আব্দুল বার, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়াহ, ১৪১৭ হি.)



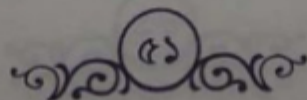
২. ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ. বলেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. বলতেন —
মালেক ইবনে আনাসের সামনে আমরা কোন ছাড়? আমরা তো ইমাম মালেকের
পদাবলি অনুসরণ করে চলতাম। উস্তাদের ক্ষেত্রে যদি মালেক তাঁর কাছ থেকে
হাদিস লিখেছেন দেখতাম, তাহলে আমরাও তাঁর কাছ থেকে হাদিস লিখতাম।
(আল-ইনতিকা ফি ফাযাইলিল আইম্মাতিস সালাসাতিল ফুকাহা, পৃ. ৫৩, হাফেয ইবনে
আব্দুল বার, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়াহ, ১৪১৭ হি.)



৩. ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'লা বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ি রহ.-কে বলতে
শুনেছি, আলিমদের কথা যদি আলোচনা করা হয়, তাহলে ইমাম মালেক হলেন
তাঁদের মাঝে তারকাতুল্য। মালেক ইবনে আনাসের চেয়ে বেশি কোনো উস্তাদ
আমার প্রতি অনুগ্রহ করেননি। (আল-ইনতিকা ফি ফাযাইলিল আইম্মাতিস সালাসাতিল
ফুকাহা, পৃ. ৫৫, হাফেয ইবনে আব্দুল বার, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়াহ, ১৪১৭ হি.)



৪. হারুন ইবনে সাইদ বলেন, হাদিস ও রেওয়াযাতের ইখতেলাফ উল্লেখ করে
ইবনে ওয়াহবকে বলতে শুনেছি— যদি আমি ইমাম মালেকের সাক্ষাৎ না পেতাম,



❀ চার তারা

তাহলে গোমরাহ হয়ে যেতাম। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/৭৫, ইমাম যাহাবি, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০২ হি.)



৫. ইমাম শাফিয়ি বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলতেন, “ইমাম মালেকের কাছে আমি তিন বছরের কিছু বেশি ছিলাম। তাঁর মুখ থেকে সাতশোরও বেশি হাদিস আমি শুনেছি”। এজন্য ইমাম মুহাম্মাদ যখন ইমাম মালেক থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন, তখন তাঁর দরসগাহ লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত। অন্য কুফি মুহাদ্দিসের হাদিস বর্ণনা করলে এত ছাত্র আসত না। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/৭৫, ইমাম যাহাবি, মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০২ হি.)





ইমাম আশ-শাফ'ঈ

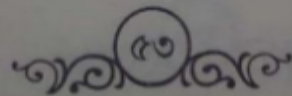
রবি ও কবি

✽ এক ✽

দুই বছরের শিশুকে কোলে নিয়ে ফাতিমা বিনতে আব্দুল্লাহ চলছেন মক্কার পথে। ফিলিস্তিনের গাঁজা উপত্যকা থেকে মক্কা দীর্ঘ পথের যাত্রা। প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় ফাতিমা যাত্রা করছেন। কয়েকদিন আগে ছেলের বাবা ইন্তেকাল করেছেন। ফাতিমা চান না ছেলেকে নিয়ে গাঁজার দুর্গম এলাকায় পড়ে থাকতে। তারচেয়ে বরং মক্কায়ে গিয়ে পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের সাথে থাকাটা ঢের ভালো।

গাঁজা ছেড়ে মক্কায়ে যাবার পেছনে ফাতিমার আরেকটা মনোবাসনা আছে। কোলের শিশুকে আলেম বানাবেন। ছেলেকে মক্কায়ে নিয়ে গেলে সে মক্কার আলেমদের সাহচর্য পাবে। তাঁর পক্ষে আলেম হওয়া সহজ হবে।

ফাতিমা বিনতে আব্দুল্লাহর বয়স মাত্র বিশ বছর। বিশ বছর বয়সেই তিনি বিধবা হন। চাইলে আরেকটা বিয়ে করে বাকি জীবন ঘর-সংসার করে কাটাতে পারেন। কিন্তু, না। তিনি মনে মনে একটা পণ করছেন। কোলের শিশুকে আলেম বানাবেন। পিতৃহীন ছেলেকে আলেম বানাতে হলে অনেক



✽ চার তারা

ধকল পোহাতে হবে। ফাতিমা পুরো জীবনটা ছেলের পেছনে কাটাবেন বলে আর বিয়ের পিঁড়িতে বসেন নি। এতিম ছেলেকে নিয়ে ছুটছেন সময়ের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠে। দীর্ঘ পথযাত্রার ক্লান্তি যেন তাঁকে স্পর্শ করছে না। ছেলের দিকে তাকিয়ে তিনি তৃপ্তির হাসি হাসছেন। এই ছেলে একদিন জগদ্বিখ্যাত আলেম হবে। মুসলিম উম্মাহ তাঁর ইলম থেকে উপকৃত হবে। সওয়াবের একটা অংশ তো তিনি নিজেও পাবেন।

[* ইমাম আশ-শাফে'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে তাঁর ছাত্র ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) মন্তব্য করেন— 'শাফে'ঈ পৃথিবীর জন্য সূর্যতুল্য'। সেই হিশেবে 'রবি'। আর তিনি যেহেতু একজন কবি ছিলেন এজন্য 'কবি'। রবি ও কবি।]

✽ দুই ✽

১৫০ হিজরী। মুসলিম উম্মাহর একই সাথে আনন্দ এবং বেদনার বছর। এই বছর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন উম্মতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইমাম আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ)। আল্লাহর সুন্নাহ হলো— তিনি মানুষকে কষ্টের সাথে স্বস্তিও দেন। যে বছর ইমাম আবু হানিফা পৃথিবী থেকে বিদায় নেন সেই বছর পৃথিবীতে আগমন করেন উম্মতের আরেকজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইমাম আশ-শাফে'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ)। অবশ্য রাবিয়া ইবনে সুলাইমান বলেন, যেদিন ইমাম আবু হানিফা ইন্তেকাল করেন, ঠিক সেদিনই জন্মগ্রহণ করেন ইমাম আশ-শাফে'ঈ।

ইমাম আশ-শাফে'ঈ জন্মগ্রহণ করেন রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বংশে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন বনু হাশিম গোত্রের আর ইমাম শাফে'ঈ বনু মুত্তালিব গোত্রের। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বংশের সাথে ইমাম শাফে'ঈর বংশ অষ্টম প্রজন্মে মিলিত হয়।

ইমাম শাফে'ঈর পুরো নাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফে'ঈ। তাঁর বয়স যখন মাত্র দুই বছর তখন তাঁর বাবা ইন্তেকাল করেন। তাঁর মা ফাতিমা বিনতে

আব্দুল্লাহ তাঁকে নিয়ে গাঁজা থেকে মক্কায় চলে আসেন। ফাতিমার ভয় ছিলো, ছেলে যদি তাঁর বংশের লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকে তাহলে সে বংশের লোকদের সাথে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলবে।

ছোট ছেলেকে ফাতিমা তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন। “দেখো বাবা, আমরা গরীব মানুষ, সহায় সম্বলহীন। আমি আমার জীবনটা তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম যাতে করে তুমি একজন আলেম হয়ে উম্মাহর খেদমত করতে পারো।”

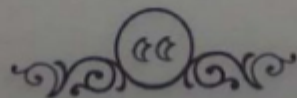
✽ তিন ✽

মক্কায় এসে শাফে'ঈ তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে বসবাস করতে লাগলেন। একটু বড় হবার পর মক্কার আলেমদের ক্লাসে যাওয়া শুরু করলেন।

ইমাম আবু হানিফা আর ইমাম মালিক ছিলেন ধনী। সেই তুলনায় পরবর্তী দুই ইমাম, ইমাম আশ-শাফে'ঈ আর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ছিলেন গরীব। প্রথম দুই ইমাম দামী দামী পোশাক পরলেও ইমাম শাফে'ঈর সেই সুযোগ ছিলো না। যার ফলে পুরনো কাপড় পরে ক্লাসে যাওয়ায় কেউ তাঁর দিকে তেমন একটা নজর দিতো না।

বাল্যকালে এমন তুচ্ছজন শাফে'ঈর সহ্য হলো না। মাকে এসে বললেন, “মা, আমি আর পড়তে যাবো না। আমাকে কেউ পাত্তা দেয় না।” ফাতিমা বালকের বাল্য অভিমানকে পাত্তা না দিয়ে বললেন, “যাও বাবা, তুমি উস্তাদের কাছে গিয়ে শুধু শুনো তিনি কী বলেন। কে তোমাকে গুরুত্ব দিলো আর কে দিলো না এটা দেখো না।”

মায়ের ছোট উপদেশ কাজে দিলো। শাফে'ঈ এবার ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ এদিকে মনোযোগ না দিয়ে শুধু শিক্ষক কী বলেন সেদিকে মনোযোগ দিলেন। শিক্ষক ক্লাসে যা পড়া দিতেন দেখা যেতো সবার আগে তিনি সেগুলো মুখস্ত করে



❁ চার তারা

নিতেন। যারা ঠিকমতো পড়ে আসতো না তাদেরকে পড়াতে শুরু করলেন।

ছাত্রের এমন প্রতিভা দেখে তো শিক্ষক মুগ্ধ। ফাতিমা শিক্ষককে টাকা দিতে গেলে শিক্ষক বললেন, “আপনার ছেলেকে পড়িয়ে টাকা গ্রহণ করা আমার জন্য ‘হারাম’। আমি টাকা নিতে পারবো না। আমি বরং তাঁকে আমার সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করলাম।”

তখন শাফে’ঈর বয়স মাত্র ছয় বছর। ছয় বছরের একটা বালককে তাঁর শিক্ষক সহকারী হিসেবে নেন। বালক শাফে’ঈর জন্য এটা ছিলো তাঁর বাল্যকালের সবচেয়ে বড় উপহার।

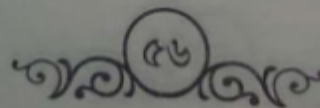
সাত বছর বয়সে শাফে’ঈ কুর’আন মুখস্ত করেন। সুললিত কণ্ঠে তিনি কুর’আন তেলাওয়াত করতেন।

হাদীস লেখার জন্য তো চামড়া-কাগজ, কালি লাগবে। এগুলো কেনার জন্য লাগবে টাকা। তিনি টাকা কোথায় পাবেন? শাফে’ঈর মা ফাতিমা বিনতে আব্দুল্লাহ মানুষের পুরনো ব্যবহৃত কাগজের খালি অংশ আর কালি যোগাড় করতেন। ছেলেকে দিয়ে বলতেন, “বাবা, এগুলোতে লিখো।”

শাফে’ঈর বয়স নয় বছর। এখন তাঁর হাদীসের কিতাব পড়ার পালা। তৎকালীন সময়ের হাদীসের শ্রেষ্ঠ কিতাব হলো ইমাম মালিকের ‘মুয়াত্তা’। কিন্তু, এই কিতাব কেনার টাকাও তো তাঁর কাছে নেই। শাফে’ঈ দেখেছেন তাঁর এক বন্ধুর কাছে কিতাবটি আছে। বন্ধুর কাছে গিয়ে অনুরোধ করলেন, “তোমার কিতাবটি কয়েকদিনের জন্য আমাকে দাও, আমি পড়ে দিয়ে দেবো।”

বন্ধুর কাছ থেকে ‘মুয়াত্তা’ এনে মাত্র নয়দিন রাখেন। এই নয়দিনে সম্পূর্ণ মুয়াত্তা মুখস্ত করে ফেলেন। নয়দিন পর বন্ধুকে বইটি ফেরত দেন। কালি দিয়ে কাগজে লিখা যে জ্ঞান নয়দিন আগে ধার নিয়েছিলেন সেই জ্ঞান এখন তাঁর অন্তরে লিপিবদ্ধ।

তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিলো প্রখর। একটা বই পড়ার সময় অপর পৃষ্ঠা ঢেকে রাখতেন যাতে করে এক পৃষ্ঠা মুখস্ত করতে গিয়ে অপর পৃষ্ঠা গুলিয়ে না ফেলেন।



ইমাম আশ-শাফে'ঈ ❀
কয়েকবছর পর তাঁর মনে হলো, তাঁর স্মৃতিশক্তি কমা শুরু করেছে। আগের
মতো সহজে কিছু মুখস্ত করতে পারছেন না। ওয়াকী নামের এক শিক্ষকের
কাছে এই সমস্যার কথা বলেন। শিক্ষক যে সমাধান দেন, সেটি তিনি কবিতা
আকারে লিখেন।

কবিতাটির অনুবাদ এমন:

“প্রিয় উস্তায় ওয়াকী’র কাছে করলাম অভিযোগ—

আমার স্মরণশক্তি কমেছে, কিভাবে ছাড়বো এ রোগ?

তিনি বললেন, তুমি পাপ ছাড়ো

এরপর তিনি বললেন আরো—

বৎস! ইলম হলো এক ‘নূর’ আল্লাহ তা’আলার!

পাপীদের দেয়া হয় না কখনো এই নূর উপহার!”

[শেষরাত্রির গল্পগুলো, আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০]

❀ চার ❀

প্রাথমিক পড়ালেখা সমাপ্ত করার পর ফাতিমা চাইলেন ছেলে এবার বিশুদ্ধ
আরবি শিখুক। বিশুদ্ধ আরবি শেখার জন্য ফাতিমা শাফে'ঈকে হুদাইল গোত্র
পাঠালেন। এই গোত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু
আনহু)। কুর'আন যেভাবে নাজিল হয়েছিলো সেভাবে কুর'আন শেখার জন্য
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনে
মাসউদের (রা:) কাছে যাবার জন্য বলেন।

❁ চার তারা

শাফে'ঈ হুদাইল গোত্রের সাথে বসবাস করে বিশুদ্ধ আরবি শিখেন, আরবের বিখ্যাত কবিতাগুলো শিখেন, কবিতার ছন্দ রপ্ত করেন। হুদাইল গোত্রের লোকেরা কথা বলতো কাব্যিক ভাষায়। তাদের সাথে বসবাস করে এই গুণটা শাফে'ঈ শিখে নেন। ভবিষ্যতে এই গুণটা তাঁকে একজন বড় মাপের কবি হতে সাহায্য করে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “কোনো কোনো কবিতার মধ্যে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা আছে।” [সহীহ বুখারী: ৬১৪৫]

ইমাম শাফে'ঈ কাব্যিক গুণটা তাঁর কথার মধ্যেও ধরে রাখেন। তিনি ছিলেন কথার জাদুকর। তাঁর কথা শুনার জন্য মানুষজন ভীড় করতো। তিনি শিক্ষকের আসনে বসলে তাঁর কথা শুনতে অনেক বেদুইন ভীড় জমাতো। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতো, “তোমরা কি পড়তে আসছো?” তারা জবাব দিতো, “না, আমরা শুধু শাফে'ঈর কথা শুনতে আসছি। দেখো তিনি কী সুন্দর কথা বলেন!”

নিজের জ্ঞান পিপাসা নিয়ে তিনি একটি কবিতা লিখেন।

কবিতাটির অনুবাদ এমন:

“সারারাত জেগে জ্ঞান আহরণে যেই স্বাদ আমি পাই
সতী কুমারীর পরশেও যেন তত আনন্দ নাই
রাতভর শুধু অধ্যয়নের মাঝে যে তৃপ্তি আছে
প্রিয়ার কোমল আলিঙ্গনও তুচ্ছ সেটার কাছে।”

[সবুজ চাঁদের নীল জোছনা, আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব, ‘জ্ঞানের স্বাদ’, পৃষ্ঠা ৬৩]

❀ পাঁচ ❀

ইতোমধ্যে শাফে'ঈ মক্কায় শিক্ষকের আসন লাভ করেন। মক্কার মুফতি মুসলিম ইবনে খালিদ আল-জাঙ্গী তাঁকে ফতোয়া দেবার অনুমতি দেন।

মক্কায় কয়েক বছর কাটানোর পর তাঁর বয়স যখন তেইশ বছর তখন পূর্ণ হলো তখন তিনি তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ আলেম, ইমাম মালিকের সাথে দেখা করার ইচ্ছাপোষণ করেন। শাফে'ঈর ইচ্ছার কথা শুনে মক্কার গভর্নর শাফে'ঈর জন্য একটা সুপারিশপত্র লিখে দেন। এটা দেখে যাতে ইমাম মালিক তাঁকে গ্রহণ করেন।

১৭৩ হিজরী। শাফে'ঈ মদীনায় গেলেন। ইমাম মালিকের সাথে তাঁর দেখা হলো। শাফে'ঈ মক্কার গভর্নরের লিখা সুপারিশপত্র ইমাম মালিকের হাতে দিলেন। পত্রটি দেখে ইমাম মালিক একটু বিরক্ত হলেন। বললেন— “সুবহানআল্লাহ! আজকাল জ্ঞানার্জনের জন্য গভর্নরের মধ্যস্থতা লাগে!”

শাফে'ঈকে দেখে ইমাম মালিক বুঝতে পারলেন, ছেলেটার মধ্যে প্রতিভার ঝলক আছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, “তুমি কিভাবে জ্ঞানার্জন করতে পছন্দ করো?” কথার জাদুকর শাফে'ঈ জবাব দিলেন, “একজন মা যেভাবে তাঁর হারানো সন্তানকে খুঁজেন সেভাবে।”

নতুন ছাত্রের কথা শুনে ইমাম মালিক খুশি হলেন। প্রথম দিন তাঁকে কিছু উপদেশ দিলেন— “শোনো মুহাম্মদ, ইভাকিল্লাহ— (আল্লাহকে ভয় করবে)। আল্লাহর অবাধ্য হয়ো না। আল্লাহ তোমার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিবেন। আল্লাহ তোমার অন্তরে যে নূর দিয়েছেন সেটা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে সেটাকে নিভিয়ে দিও না। আর আজকে চলে যাও। আগামীকাল এসে আমাকে শুনিও তুমি কী জানো।”

❁ চার তারা

পরেরদিন শাফে'ঈ ইমাম মালিককে তাঁর নিজের সংকলিত 'মুয়াত্তা' মুখস্ত শুনাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ শুনানোর পর শাফে'ঈ ভাবলেন আর হয়তো লাগবে না। কিন্তু ইমাম মালিক মুগ্ধ হয়ে শাফে'ঈর পড়া শুনছেন। শাফে'ঈর সুমধুর উচ্চারণ দেখে তিনি বিস্মিত। শাফে'ঈকে বললেন, "চালিয়ে যাও, বাবা। চালিয়ে যাও।" এভাবে কয়েকদিন শাফে'ঈ মালিককে মুয়াত্তা শুনানো শেষ করেন।

ইমাম মালিকের ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত শাফে'ঈ ছয় বছর তাঁর সান্নিধ্যে কাটান। এই ছয় বছরে তিনি ইমাম মালিকের কাছ থেকে 'শ্রেষ্ঠ ছাত্র' আখ্যা লাভ করেন। ইমাম মালিকের ছাত্র থাকাবস্থায় শাফে'ঈ শিক্ষকের কয়েকটা মতের সাথে দ্বিমত করেন।

একবার এক লোক এসে বললো, "আমি আমার স্ত্রীর সাথে খোশগল্প করছিলাম। গল্পের এক পর্যায়ে আমি তাকে বলে ফেললাম— তুমি যদি চাঁদের চেয়ে সুন্দরী না হও তাহলে তুমি তালাক। এখন বলুন আমার স্ত্রী কি তালাক হয়ে গেছে?" ইমাম মালিক বললেন, "হ্যাঁ। এক তালাক হয়ে গেছে।"

শাফে'ঈ শিক্ষকের এই ফতোয়া শুনে বললেন, "না। আপনার স্ত্রী তালাক হয়নি।" মালিক জিজ্ঞেস করলেন, "কিভাবে?" শাফে'ঈ কুর'আনের একটা আয়াতের রেফারেন্স দিলেন—

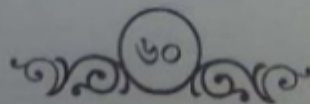
.....
"নিশ্চয়ই আমি মানুষকে গঠন করেছি সর্বোত্তম গঠনে"

[সূরা আত-ত্বীন ৯৩:৪]
.....

যেহেতু আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু মানুষ চাঁদের চেয়েও সুন্দর।

ইমাম মালিক ছাত্রের ফতোয়াটি গ্রহণ করলেন।

ইমাম মালিক ইন্তেকাল করলে শাফে'ঈ নাজরানে চলে যান। নাজরানে গিয়ে সেখানকার ক্বাদির পদ অলঙ্কৃত করেন।



✽ ছয় ✽

নাজরান ছিলো ইয়ামেনের একটা প্রদেশ। এখানকার লোকেরা ঘুষ দেওয়া-নেওয়ায় অভ্যস্ত। ইমাম আশ-শাফে'ঈ নাজরানের ক্বাদি হবার পর স্থানীয় লোকেরা খুব একটা সুবিধা করতে পারছিলো না। তাদের অপকর্মগুলো বারবার ধরা পড়ছে আর ইমাম শাফে'ঈ তাদেরকে দণ্ড দিচ্ছেন। একটা সময় তারা অতিষ্ঠ হয়ে নাজরানের গভর্নরের কাছে কানপড়া দিলো। গভর্নর ছিলেন আরেকজন দুর্নিতিবাজ।

ইমাম শাফে'ঈকে কিভাবে উৎখাত করা যায় এই চিন্তায় তিনিও পেরেশান হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে সরাসরি খলিফার নিকট একটা পত্র লিখে বলেন, “আমার প্রদেশের ক্বাদি একজন শিয়া। সে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে।” গভর্নরের কাছ থেকে সতর্কবার্তা পেয়ে হারুন-অর-রশিদ নির্দেশ দেন— “তাকে গ্রেফতার করে আমার দরবারে পাঠাও।”

ইমাম শাফে'ঈ একে তো ছিলেন নবীর বংশধর, তাঁর উপর তিনি আহলে বায়াতের প্রশংসা করে কবিতা লিখতেন। অন্য দিকে খিলাফতের মসনদে আব্বাসীরা। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে শাফে'ঈর মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।

শাফে'ঈ সহ আরো নয়জনকে গ্রেফতার করে খলিফা হারুন-অর-রশিদের কোর্টে পাঠানো হয়। শাফে'ঈ ছাড়া বাকি নয়জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ইমাম শাফে'ঈ বেঁচে যান তাঁর কথার জাদু দিয়ে। হারুন-অর-রশিদের বংশের বর্ণনা দিয়ে তিনি বুঝান আমরা তো ‘ভাই-ভাই’। ইমাম শাফে'ঈর পক্ষে কথা বলেন হারুন-অর-রশিদের পছন্দের আলেম ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী।

হাসান আস-শায়বানী ছিলেন ইমাম আবু হানিফার প্রিয় ছাত্র, হানাফি মাজহাবের বিখ্যাত ফকীহ। খলিফা হারুন-অর-রশিদ এই দুই ইমামকে একত্রে গবেষণা

❁ চার তারা

করার সুযোগ দেন। শাফে'ঈ হানাফী মাজহাব সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারেন শায়বানীর কাছ থেকে। মাঝেমাঝে তারা দুজন বিতর্ক করতেন। খলিফা দুই ইমামের ইলমী বিতর্ক উপভোগ করতেন।

খলিফা হারুন-অর-রশিদের কোর্টে যখন ইমাম আশ শাফে'ঈ যান তখন তাঁর বয়স ছিলো চৌত্রিশ বছর। শায়বানীর সাথে তিনবছর কাটিয়ে যখন আবার মক্কায় ফিরেন তখন তাঁর বয়স সাইত্রিশ বছর। এই তিন বছর শায়বানীর কাছ থেকে যা শিখেন তা লিখে এক উটে বোঝাই করে মক্কায় নিয়ে আসেন।

একবার খলিফা তাঁকে ৫০০০০ দিরহাম দিলেন। সে রাতে শহরের সকল ভিখারি একত্রিত হলো। ভিখারিদের মধ্যে এক ধরনের খুশির আমেজ ছড়িয়ে গেলো। খলিফা জিজ্ঞেস করলেন, “আজকে শহরে কিসের পার্টি হচ্ছে?” তাকে বলা হলো, “আপনি শাফে'ঈকে যে অর্থকড়ি দিয়েছিলেন, সেগুলো তিনি শহরের সকল ভিখারিকে দান করে দেন।”

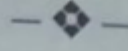
ইরাকে থাকাবস্থায় ইমাম শাফে'ঈ বেশ কয়েকবার ইমাম আবু হানিফার কবর জিয়ারত করেন। আবু হানিফার ফিক্বহ পড়ার পর বলেন— “আমরা ফিক্বহের বেলায় আবু হানিফার সন্তানতুল্য।”

❁ সাত ❁

ইমাম আশ-শাফে'ঈ আবার মক্কায় ফিরলেন। মক্কায় ফিরে মসজিদুল হারামে দরস দেওয়া শুরু করেন। হজ্জের সময় পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে লোকজন তাঁর ক্লাসে জড়ো হয়। তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন আহমাদ ইবনে হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ)।

আহমাদ ইবনে হাম্বল ইমাম শাফে'ঈর কাছে ইমাম মালিকের ‘মুয়াত্তা’র ক্লাস করেন। প্রসিদ্ধ চার মাজহাবের মধ্যে এক মাজহাবের ইমাম ছিলেন ইমাম

শাফে'ঈর শিক্ষক, আরেক মাজহাবের ইমাম তাঁর ছাত্র। আরেক মাজহাবের ইমাম আবু হানিফার ছাত্র শায়বানী ছিলেন তাঁর শিক্ষক।



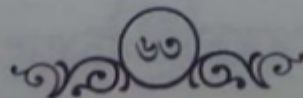
ইমাম আশ-শাফে'ঈ ইমাম মালিকের মতো গুরুগম্ভীর ছিলেন না। মাঝেমাঝে ছাত্রদের সাথে রসিকতাও করতেন।

- একদিন এক লোক এসে জিজ্ঞেস করলো, “আগুন দিয়ে তৈরি জ্বিনকে আল্লাহ আগুন দিয়ে শাস্তি দিবেন কিভাবে?”
- ইমাম শাফে'ঈ তৎক্ষণাৎ একটা মাটির টুকরো নিয়ে লোকটাকে ছুঁড়ে মারলেন।
- সে তো অবাক। “আমাকে আঘাত করলেন কেন?”
- ইমাম শাফে'ঈ হেসে বললেন, “মাটির তৈরি মানুষকে মাটি দিয়ে আঘাত করলে যদি ব্যাথা পায় তাহলে আগুনের তৈরি জ্বিনকেও আল্লাহ আগুন দিয়ে আঘাত দিতে পারবেন।



ইমাম শাফে'ঈ বিতর্কে পারদর্শী ছিলেন। বিতর্কে কোনোদিন তাঁকে কেউ পরাজিত করতে পারেনি। বিতর্ক গুরুত্ব আনে তিনি দু'আ করতেন— “হে আল্লাহ! আমাদের অন্তর সত্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিন। আমাদের মধ্যে যে পক্ষ সত্যের উপর তাঁকে বিজয়ী করুন।” সত্য সন্ধানে তিনি এতোটাই অনুসন্ধিৎসু ছিলেন যে, বিতর্কে বিজয়ী হবার চেয়ে সত্য উন্মোচনের ব্যাপারে বেশি মনোযোগী ছিলেন।

বিতর্কে সাধারণত উচ্চস্বরে কথা বলতে হয়। কিন্তু, ইমাম শাফে'ঈ খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলতেন। তাঁর ছেলে বলেন, “তিনি এমনভাবে বিতর্ক করতেন যে, কখনো উত্তেজিত হয়ে উচ্চস্বরে কথা বলেননি।”



❁ চার তারা

একবার আবু ইউনুস সিদ্দী নামের একজনের সাথে তিনি বিতর্ক করেন।
বিতর্কে পরাজিত হয়ে আবু ইউনুস রাগে-ক্ষেভে মসজিদ থেকে বের হতে
চাইলে ইমাম শাফে'ঈ তাঁর হাত ধরে বলেন, “যদিও আমরা কিছু ব্যাপারে
ভিন্নমত পোষণ করি, তাই বলে কি আমরা দ্বীনি ভাই নয়?” প্রতিপক্ষকে
দলিল-যুক্তি দিয়ে যেভাবে পরাজিত করতেন তেমনি ভালোবাসা দিয়ে তাঁদের
মন জয় করে নিতেন।

তিনি যখন শুনতে পান তাঁর ছাত্ররা তাঁর প্রতিপক্ষকে ‘মিথ্যাবাদী’ বলে গালাগালি
দিচ্ছে তখন তিনি ছাত্রদেরকে সতর্ক করে বলেন— “এমন শব্দ উচ্চারণ করবে
না। তোমরা নিজেদের মুখ এবং কানের হেফাজত করো।”



একবার এক ভরা মজলিশে একজন উঠে জিজ্ঞেস করলো— “আপনিই কি
শাফে'ঈ?” ইমাম শাফে'ঈ হ্যাঁ বললে লোকটি বলে উঠলো— “তুমি একজন
নিকৃষ্ট পাপী।” ইমাম শাফে'ঈ তৎক্ষণাৎ দু'আ করলেন, “ইয়া আল্লাহ! লোকটি
যা বললো তা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাকে ক্ষমা করুন। আর যা বললো তা
যদি মিথ্যে হয় তাহলে মিথ্যে বলার জন্য তাকেও ক্ষমা করুন।”

কুর'আনের আল্লাহ বলেন, “আর রহমানের বান্দা তারাই, যারা
পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে
সম্বোধন করে, তখন তারা বলে ‘সালাম’। [সূরা আল-ফুরকানঃ ২৫:৬৩]

ইমাম শাফে'ঈ কুর'আনের নির্দেশনা অনুযায়ী সবসময় নির্বোধ লোকদের
পরিহার করে চলার চেষ্টা করতেন, তাদের মন্তব্যকে পাত্তা দিতেন না। নির্বোধ
আর নিন্দুকদেরকে কিভাবে ‘ডিল’ করা উচিত, এটা নিয়ে তিনি একটা কবিতা
লিখেন।

কবিতাটির অনুবাদ:

“নির্বোধ আর অজ্ঞ লোকের কাছ থেকে দূরে থাকো!
দেখবে নিজের কথাই ডুবাবে তাকে, তুমি জেনে রাখো।
ফোরাতে মতো সমুদ্রসম এত বড় এক নদী
কী হবে, একটা দুইটা কুকুর মরে ভেসে যায় যদি?
ফোরাতে কয়টা কুকুর মরে তো নাপাক হয় না পানি
ওদের কতক কথায় তোমার হবে সম্মানহানী?”

[মেঘপাখি, আব্দুল্লাহ আমহমুদ নজীব, পৃষ্ঠা ৩৪]

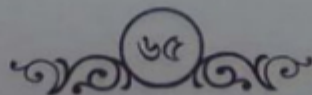


খলিফা উমরের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মতো শাফে'ঈ ও সবসময় সাথে একটা লাঠি রাখতেন। তিনি যে পৃথিবীর একজন পর্যটক, সেটি মনে করিয়ে দেবার জন্য লাঠিটি কাজে আসতো।

❁ আট ❁

মক্কায় আরো নয় বছর কাটানোর পর ইমাম শাফে'ঈ মিসরে চলে যান। মিসরে তখন ইমাম আল-লাইস ইবনু সা'দের (রাহিমাল্লাহু) মাজহাব বেশ জনপ্রিয় ছিলো। ইমাম শাফে'ঈ লাইস ইবনু সা'দের শিক্ষার্থীদের কাছে তাঁর মাজহাব সম্পর্কে জানেন। বেশ কয়েকবার তিনি লাইস ইবনু সা'দের কবর জিয়ারত করেন।

মিসরে এসে আবার নতুন করে ক্লাস নেওয়া শুরু করেন। নানান প্রান্ত থেকে ছাত্ররা আবারো তাঁর বাক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর ক্লাসে ভিড় জমাতে লাগলো।



❁ চার তারা

তাঁর নানামুখী গুণ দেখে মিসরবাসী বিস্মিত হলো। মিসরের একজন ডাক্তার ইমাম শাফে'ঈর ডাক্তারি বিদ্যা দেখে ভাবলেন— শাফে'ঈ নিশ্চয় ইরাকের কোনো বড় ডাক্তার হবেন!

১৯৮ হিজরীতে খিলাফতের আসনে বসেন খলিফা মামুন। মুসলিম বিশ্বে প্রথমবারের মতো মু'তাজিলা মতবাদ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। খলিফা মামুন এই ভ্রান্ত মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

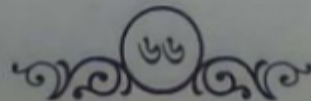
ইতোমধ্যে ইমাম শাফে'ঈ তাঁর শ্রেষ্ঠ কিতাব 'আর রিসালা' লিখেন। এই কিতাবটি ইসলামি আইনশাস্ত্রের ক্লাসিক্যাল কিতাবগুলোর মধ্যে একটি। 'আর রিসালা' ছাড়াও ইমাম শাফে'ঈ একশোর অধিক কিতাব লিখেন। কবিতার বই লিখেন— দিওয়ানে শাফে'ঈ।

হাদীস, ভাষাবিজ্ঞান, ফিকহ, বিতর্ক, কাব্য, কুর'আন তেলাওয়াত সবগুলো শাখায় তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। পড়ালেখা ছাড়া তীর চালানোতেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। একজন পলিম্যাথ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “নিশ্চয় আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রতি একশো বছরের শিরোভাগে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি এই উম্মতের দ্বীনকে তাঁর জন্য সঞ্জীবিত করবেন।” [সুনানে আবু দাউদঃ ৪২৯১]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের সময়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, “আপনি কি এই শতকের মুজাদ্দিদ?” ইমাম আহমাদ জবাব দিলেন, “না। উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন প্রথম শতকের মুজাদ্দিদ আর আমি আশা করি এই শতকের মুজাদ্দিদ হলেন ইমাম আশ-শাফে'ঈ।”

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মনে শিক্ষকের প্রতি ছিলো গভীর ভালোবাসা। তিনি ইমাম শাফে'ঈর ছেলেকে বলতেন, “আমি প্রতিদিন ছয়জন মানুষের জন্য দু'আ করি। তাঁর মধ্যে একজন হলেন তোমার বাবা।”



✽ নয় ✽

কয়েকবছর মিসরে কাটানোর পর ইমাম শাফে'ঈ মাজহাবী উগ্রবাদীদের রোষানলে পড়েন। তিনি একে তো ছিলেন একজন মুজতাহিদ, অন্যদিকে ইমাম মালিকের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। তবে তাঁর কিছু ফতোয়া ছিলো ইমাম মালিকের মতের বিপরীতে। মিসরে মালিকী মাজহাবের কয়েকজন অনুসারী তাঁর সাথে এসে বিতর্ক করেন।

যেই শাফে'ঈকে ইমাম মালিক তাঁর 'শ্রেষ্ঠ ছাত্র' বলে সম্বোধন করেন সেই শাফে'ঈ 'মালিকী-বিরোধী' বলে মাজহাবের গোঁড়া সমর্থকদের রোষানলে পড়েন।

২০৪ হিজরীর এক শুক্রবার ইমাম শাফে'ঈ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইমাম লাদিত ইবনে সা'দের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।



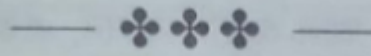
❁ চার তারা

❖ ইমাম আশ-শাফে'ঈর উক্তি সমাহারঃ

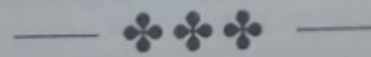
- তোমার নাফসকে যদি সত্যের প্রতি ব্যস্ত না রাখো, তাহলে সেটি মিথ্যার প্রতি ব্যস্ত হয়ে যাবে।
- যা মুখস্ত করা হয় তা জ্ঞান নয়। যা উপকারে আসে তা-ই জ্ঞান।
- যে তোমার উপস্থিতিতে কারো গিবত করে, সে তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার গিবত করে।
- তাহাজ্জুদের দু'আ হলো তীরের মতো; যা কখনো লক্ষ্যচ্যুত হয় না।
- সময় হলো তরবারির মতো। এটা দিয়ে যথাযথ কাটতে না পারলে, এটিই কেটে দেয়।
- মনুষ্যত্বের খুটি হলো চারটিঃ সচ্চরিত্র, দানশীলতা, নম্রতা, নিষ্ঠা।
- মানুষ যদি বুদ্ধিমান হতো তাহলে অন্যের পাপের চেয়ে নিজের পাপ নিয়ে বেশি চিন্তিত থাকতো।
- আল্লাহর শত্রুদের তীরগুলো দেখো কোনদিকে যায়। তীরগুলো যেদিকে যাবে, সত্যকে সেদিকে খুঁজবে।
- আমার হৃদয় এই ভেবে শান্তিতে আছে- আমার যা পাবার তা আমি পাবো, আর আমি যা পাইনি, তা আমার পাবার ছিলো না।
- হে আল্লাহ! আমি না চাইতে আপনি আমাকে ইসলামের নিয়ামত দিয়েছেন। এখন আমি জাম্নাত চাচ্ছি, আমাকে জাম্নাত দান করুন।
- সেই রাজ্যে বসবাস করো না, যেই রাজ্যে একজন আলেম নাই যে তোমাকে দ্বীনের কথা বলবে, আর একজন ডাক্তার নাই, যে তোমার স্বাস্থ্যের কথা বলবে।

❖ ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর সম্পর্কে কিছু কণ্ডল—

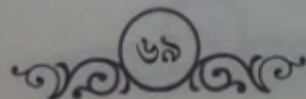
১. ইউনুস সাদাফি বলেন, শাফিয়ির মতো বুদ্ধিমান মানুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি। একদিন কোনো এক মাসয়ালায় তাঁর সাথে দালিলিক বিতর্কে লিপ্ত হই। বিতর্ক শেষে যে যার মতো চলে যাই। আরেকদিন দেখা হলে শাফিয়ি আমার হাত ধরে ফেলেন; তারপর বলেন— “আবু মুসা, কোনো মাসয়ালায় একমত না হলেও আমরা ভাই-ভাই হয়ে থাকব— এটা কি ভালো নয়”? (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/১৬, ইমাম যাহাবি। মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০২ হি.)



২. আবু আব্দুল্লাহ সাগানি বলেন, একবার ইয়াহইয়া ইবনে আকসামের কাছে আবু উবাইদ ও শাফিয়ি সম্পর্কে জানতে চাই। উত্তরে তিনি বলেন— আবু উবাইদ এখানে প্রায়ই আসতেন। আবু উবাইদ কিতাবের সাহায্য পেলে চমৎকার গ্রন্থ রচনা করতেন; আরবিভাষায় পাণ্ডিত্য থাকার কারণে সুন্দর শব্দাবলি দিয়ে গুছিয়ে লিখতেন। আর শাফিয়ি ছিলেন অভাবনীয় এক ব্যক্তি। আমরা মুনাযারার সময় প্রায়ই মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের কাছে থাকতাম। মেধা, বোধ ও বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন কুরাইশ আভিজাত্যের ধারক। বোধ-বুদ্ধি ও মেধা ছিল স্বচ্ছ। একসাথে অনেক হাদিস শুনলেও খুব দ্রুত সঠিকভাবে বলে দিতে পারতেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত যদি কেবল তাকে অনুসরণ করে, তাহলে আর অন্য কোনো ফকিহর দরকার নেই। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/১৭, ইমাম যাহাবি। মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০২ হি.)



৩. মা'মার ইবনে শাবিব বলেন, আমি খলিফা মামুনকে বলতে শুনেছি— মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিসকে আমি সব বিষয়ে পরীক্ষা করেছি; এবং তাকে একজন পরিপূর্ণ জ্ঞানীরূপে পেয়েছি। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/১৭, ইমাম যাহাবি। মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০২ হি.)



❁ চার তারা

৪. রবি' ইবনে সুলাইমান বলেন, ইমাম শাফিয়ি সদকা করেননি, এমন কোনোদিন তাঁর যায়নি। সদকা করতেন রাতে। রমযান এলে প্রচুর কাপড়-চোপড় ও অর্থ দান করতেন। দরিদ্র ও দুর্বলদের প্রতি সহমর্মিতা দেখাতেন, তাদের খোঁজখবর নিতেন। পরিচিত সকলের অবস্থা জেনে তাদের সাথে সদাচার করতেন। (মানাকিবুশ শাফিয়ি ২/২৮৪, ইমাম বাইহাকি, দারুত তুরাস, ১৩৯০ হি.)

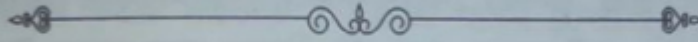


৫. হারুন ইবনে সাইদ আল-আইলি বলেন, একবার শাফিয়ি আমাদের এখানে আসেন। তাঁর মতো এত সুন্দর নামাজ আর কারও দেখিনি; তাঁর মতো সুদর্শন অবয়ব আর কারও দেখিনি। নামাজ শেষ করে তিনি কথা বলেন। তাঁর মতো কেউ সুন্দর কথা বলতে পারে—এমনও দেখিনি। (মানাকিবুশ শাফিয়ি ২/২৮৪, ইমাম বাইহাকি, দারুত তুরাস, ১৩৯০ হি.)





ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল



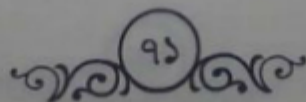
সাগরচারী পাহাড়

✽ এক ✽

বাগদাদ, মুসলিম খিলাফতের রাজধানী। এই শহরকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের রাজনৈতিক বিন্যাস। রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেবার পাশাপাশি শহরটি জ্ঞান-বিজ্ঞানেও পরিণত হয়েছে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে জ্ঞানান্বেষীরা জড়ো হয় এই শহরে। রাজনৈতিক রাজধানীর পাশাপাশি বাগদাদ আন্তে আন্তে জ্ঞান সাধনার তীর্থস্থানে পরিণত হচ্ছে।

১৬৪ হিজরী। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকালের প্রায় দেড়শো বছর কেটে গেছে। এই দেড়শো বছর মুসলিম উম্মাহ অনেক চড়াই-উতরাই পাড়ি দেয়। এরইমধ্যে খিলাফতের পালাবদল হয় বেশ কয়েকবার।

রবিউল আউয়াল মাস। সাফিয়া বিনতে মাইমুনা নামের বাগদাদের এক মহিলার ঘরে জন্ম হয় এক আলোকিত শিশু। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মের মাসে তাঁর জন্ম। বাবা-মা তাঁর নাম রাখেন রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে। আহমাদ।



❁ চার তারা

[* ইমাম আহমাদের (রাহিমাহুদ্দাহ) হাদীসের যে জ্ঞান ছিলো সেটাকে সাগরের সাথে তুলনা করে একজন বলেন- 'ইমাম আহমাদের সনদ হলো সাগরের মতো'। আর তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে পুরোটা জীবন পাহাড়ের মতো অটল থেকে সংগ্রাম করেছেন। কারাবরণ করেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছে কিন্তু নিজের অবস্থান থেকে সরে যাননি। এই দিক থেকে তিনি ছিলেন সাগরচারী পাহাড়।]

আহমাদ বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাই বলে তিনি অনারবী বা পার্সিয়ান ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ আরব। তিনি ছিলেন শায়বানী গোত্রের। আবু বকরের (রাডিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফতকালে পারসিকদের বিপক্ষে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন আল-মুসান্না ইবনে হারিসা। তাঁর গোত্র আর আহমাদের গোত্র একই গোত্র।

রাসূলুদ্দাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন তিনি তাকে দুঃখকষ্টে পতিত করেন।” [সহীহ বুখারী: ৫৬৪৫]

আহমাদের ছোটবেলা শুরু হয় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। যে মানুষটি মুসলমানদের হয়ে একাই শাসকের বিরুদ্ধে লড়বেন, যে মানুষটির দৃঢ়তার উপর মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিজয় নির্ভর করছে সেই মানুষকে আল্লাহ ছোটবেলা এক পরীক্ষা দিয়ে বড় পরীক্ষার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করেন।

আহমাদের বয়স যখন দুই বছর তখন তাঁর বাবা ইন্তেকাল করেন। ছোটবেলায় যে ছেলেটি বাবা হারিয়ে 'একা' হয়ে পড়েন, বড় হয়েও তাঁকে শাসকের ভ্রান্ত আকিদার বিরুদ্ধে একাই লড়তে হয়।

আহমাদের বাবার নাম ছিলো মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল। দাদার নাম হাম্বল ইবনে হিলাল। তাঁর দাদা হাম্বল ছিলেন উমাইয়্যা খিলাফতকালের একজন গভর্নর। বংশের সম্মানিত মানুষের নামের সাথে সন্তানের নাম জুড়ে দেবার একটা প্রবণতা থেকে আহমাদের নাম তাঁর দাদার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। আহমাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়। তিনি পরিচিতি লাভ করেন আহমাদ ইবনে হাম্বল নামে।

❁ দুই ❁

আহমাদ ইবনে হাম্বল প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন মুসলিম খিলাফতের রাজধানী বাগদাদে। খিলাফতের রাজধানী হিশেবে বাগদাদে গড়ে উঠেছিলো অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাকেন্দ্র। ছোটবেলায় তাঁর পরিবার তাঁকে আরবি ভাষা এবং কুর'আন শেখায়। ইসলামি শিক্ষার মূল উৎস কুর'আন শেখার পর তাঁর পরিবার তাঁকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পাঠায় লেখালেখি শেখার জন্য।

আহমাদের মুখস্ত করার সক্ষমতা ছিলো বিস্ময়কর। সহপাঠীরা তাঁর সাথে পাল্লা দিয়ে মুখস্ত করতে পারতো না। ব্যক্তিগত শিক্ষক রেখে আহমাদকে পড়ানোর মতো সামর্থ্য তাঁর পরিবারের ছিলো না। তবুও দেখা যেতো যারা ব্যক্তিগত শিক্ষকের কাছে পড়তো তাদের চেয়ে আহমাদ এগিয়ে থাকতেন।

এক বাবা আফসোস করে বলতেন, “আমি আমার সন্তানদেরকে পড়ানোর জন্য বাসায় শিক্ষক রেখেছি। কিন্তু, তারা তেমন ভালো করতে পারে নাই। অথচ দেখো আহমাদ ইয়াতিম-অভাবী হওয়া সত্ত্বেও কেমন এগিয়ে গেছে! তাঁর জ্ঞানার্জন, ব্যবহার দুটোই প্রশংসনীয়।”

ছোট্ট আহমাদের মধ্যে যে প্রতিভার ঝলক ছিলো সেটা কারো কারো চোখে পড়ে। আরবিতে একে বলে ‘ফিরাসা’। ফিরাসা হলো কারো বাহ্যিক গুণাবলি দেখে তাঁর সক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করা।

আল-হাইসাম ইবনে জামিল নামের একজন আলেম ছোট্ট আহমাদকে দেখে বলেন, “এই ছেলেটা যদি বেঁচে থাকে, তাহলে আমি আশা করি সে তাঁর সময়ের মানুষের বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ হবে।”

বাগদাদে তখন ইরাকের আলেমদের ফিকহ ছিলো লিখিত। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানীর তত্ত্বাবধানে এগুলো লিখা হয়।

❁ চার তারা

আহমাদ ইবনে হাম্বলের জীবনের প্রথম শিক্ষক ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ; যিনি ছিলেন আবার ইমাম আবু হানিফার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। ইমাম আবু হানিফা আবু ইউসুফকে স্কলারশিপ দেন, নিজের সন্তানের মতো তিনি আবু ইউসুফকে গড়ে তুলেছিলেন। ইমাম আবু হানিফার সুযোগ্য ছাত্রের তত্ত্বাবধানে আহমাদ ইবনে হাম্বলের শৈশব কাটে।

ফিকহের ক্লাস করার পাশাপাশি আহমাদ হাদীসের ক্লাসেও যেতেন। ১৭৯ হিজরীতে আহমাদ হাদীসের ক্লাসে যাওয়া-আসা শুরু করেন। বাগদাদে যে বছর আহমাদ হাদীসের ক্লাস করা শুরু করেন, মদীনায় সেই বছর ইন্তেকাল করেন হাদীসের প্রথম সংকলিত কিতাবের সংকলক ইমাম মালিক। একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ যেবছর দুনিয়া ছেড়ে বিদায় নেন, সেই বছর আব্দুল্লাহ তাঁর আরেকজন বান্দাকে হাদীস শেখায় নিয়োজিত করেন। পরবর্তীকালে সেই মানুষটি হাদীসের সর্ববৃহৎ গ্রন্থের সংকলক হন। তাঁর সংকলিত ‘মুসনাদে আহমাদ’ কিতাবটি হাদীসের এনসাইক্লোপিডিয়া হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

হাদীসের প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত করার পর আহমাদ ইরাক, সিরিয়া, হিজাজ ইসলামি জ্ঞানের তিন উর্বর ভূমি ভ্রমণ শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য পৃথিবী ঘুরে ঘুরে হাদীস সংগ্রহ করা। হাদীস সংগ্রহের এই গুরুদায়িত্ব তাঁর আগে আরো অনেকেই পালন করেছেন। ইমাম মালিক তাঁর ‘মুয়াত্তা’ লিখেন মদীনায় বসে বসে।

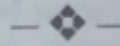
আহমাদ হাদীস শেখা শুরু করেন ১৭৯ হিজরীতে। ১৮৬ হিজরীর আগ পর্যন্ত তিনি বাগদাদের বাইরে কোথাও যাননি। এই সাত বছর তিনি বাগদাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন। বাগদাদে তাঁর হাদীস শিক্ষক ছিলেন ইমাম হুশাইম ইবনে বাশির। তাঁর কাছে তিনি একাধারে চারবছর হাদীস শিখেন।

দীর্ঘ সাত বছর ‘ঘরের হাদীস’ সংগ্রহ শেষ হলে তিনি এবার বাইরে বের হলেন। প্রথমে গেলেন বসরায়, তার পরের বছর গেলেন হিজাজে। তারপর ইয়ামেন, ইমাম আবু হানিফার শহর কুফায়।

হাদীস সংগ্রহের জন্য আহমাদ পাঁচবার বসরায় যান। হজ্জ করার জন্যও পাঁচবার মক্কায় যান। হজ্জ করার জন্য মক্কায় যাওয়া মানে কয়েক মাসের জন্য একটা 'বিশ্ববিদ্যালয়' — এ ভর্তি হওয়া। হজ্জের মৌসুমে পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে শ্রেষ্ঠ আলেমরা একত্রিত হন। জ্ঞানান্বেষণে উন্মুখ শিক্ষার্থীরা মৌমাছির মতো তাঁদের কাছে ভিড় জমায়।

দারিদ্রতা আহমাদকে সারাজীবন তাড়া করে বেড়ায়। যে পাঁচবার তিনি হজ্জ করেন তারমধ্যে তিনবার ছিলো পায়ে হেঁটে! বাগদাদ থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার। আহমাদ এতো দীর্ঘ পথ তিনবার পাড়ি দেন হেঁটে হেঁটে। হাঁটতে গিয়ে কখনো পথ হারিয়ে ফেললে হাঁক দিতেন, “ও আব্বাহর বান্দা! আমাকে হিজাজের পথটা একটু দেখাও।”

আহমাদ প্রথমবার হজ্জ করেন ১৮৭ হিজরীতে। পরের হজ্জগুলো যথাক্রমে— ১৯১, ১৯৬, ১৯৭ এবং ১৯৮ হিজরীতে।



১৮৭ হিজরীতে প্রথমবার হজ্জে গিয়ে আহমাদ সাক্ষাৎ লাভ করেন ইমাম আশ-শাফে'ঈর। শাফে'ঈ তখনো জনপ্রিয় ইমাম ছিলেন না। তাঁকে বাইরের ছাত্ররা এতোটা চিনতো না। আহমাদের সহপাঠীরা মক্কায় গিয়ে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার ক্লাসে বসতো। একদিন আহমাদ তাঁর এক সহপাঠীকে বললেন, “আসো, তোমাকে আমি এমন একজনের কাছে নিয়ে যাবো, যার মতো জ্ঞানী আরেকজনে তুমি খুঁজে পাবে না।” সহপাঠীকে হাতে ধরে আহমাদ জমজমের পাশে নিয়ে আসেন। সেখানে বসে আছেন ইমাম আশ-শাফে'ঈ। আহমাদ তাঁর বন্ধুকে ইমাম শাফে'ঈর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। শাফে'ঈর সাথে অল্পক্ষণ বসে তাঁর বন্ধুটি আহমাদের কথার সত্যতা খুঁজে পান। শাফে'ঈর জ্ঞান আর মিষ্টি কথাবার্তা শুনে তিনি বিমোহিত হন।

একটু পর তাঁর বন্ধুটি বলেন, “আসো, আহমাদ। অনেক্ষণ তো বসলাম। এবার আমাদের শিক্ষকের কাছে যাই।” আহমাদ শাফে'ঈকে দেখিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন, “উনিই তো আমার শিক্ষক!”

❁ চার তারা

আহমাদের বন্ধুর এবার চক্ষু চড়কগাছ। শাফে'ঈ জ্ঞান তাঁকে অবাক করেছে ঠিকই কিন্তু তাই বলে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার ক্লাস ছেড়ে শাফে'ঈর ক্লাসে বসতে তার মন বাধা দিলো। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা তো সরাসরি ইমাম ইবনু শিহাব আয যুহরির কাছ থেকে হাদীস শিখেছেন, যিনি কিনা ইমাম শাফে'ঈর শিক্ষাগুরু ইমাম মালিকের শিক্ষক।

বন্ধুকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে আহমাদ তাকে প্রেরণা জোগালেন, “এই মানুষটির কাছ থেকে শেখো। তাঁর সাথে তুলনা করবো এমন কাউকে আমার চক্ষুদ্বয় এখনো দেখেনি।”

আহমাদের ফিরাসার ফল পাওয়া যায় পরেরবার যখন তিনি হজ্জ করতে আসেন। পরেরবার হজ্জ করতে এসে দেখেন ইমাম আশ-শাফে'ঈ মক্কার সবচেয়ে জনপ্রিয় ইমামের আসনে। তাঁর ক্লাসে জ্ঞান পিপাসুরা পোনা মাছের মতো ভিড় করেছে।

ইমাম আশ-শাফে'ঈর কাছ থেকে আহমাদ শিখেন কিভাবে হাদীস থেকে ফিক্‌হ বের করতে হয়। এই বিষয়ের উপরই ছিলো শাফে'ঈর সবচেয়ে বেশি দখল। ইমাম আশ-শাফে'ঈর আগে এই বিষয়ের আরেকজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন ইমাম আবু হানিফা। তিনি বলেন, “যিনি হাদীস জানেন অথচ ফিক্‌হ জানেন না তার উদাহরণ হলো সেই ফার্মাসিস্টের মতো যিনি ওষুধ বিক্রি করেন কিন্তু ডাক্তার না বলার আগ পর্যন্ত জানেন না কোন রোগের কোন ওষুধ।”

ইমাম আশ-শাফে'ঈর কাছে আহমাদ ‘মুয়াত্তা’ পড়েন। তিনি বলেন, “আমি এর আগেও সতেরো জনের কাছে ‘মুয়াত্তা’ পড়েছি, কিন্তু শাফে'ঈ যেভাবে ‘মুয়াত্তা’ পড়ান এরকম আমি আর কারো কাছে পড়িনি।”

আহমাদ ইমাম শাফে'ঈর থেকে বিশটি হাদীস বর্ণনা করেন। এরমধ্যে একটি হাদীসের বর্ণনাক্রমকে (Chain of Narration) আব্দুল্লাহ ইবনে কাসির ‘সবচেয়ে চমৎকার বর্ণনাক্রম’ বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন কা'ব ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু), তাঁর থেকে আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব, তাঁর

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ❶
থেকে ইবনু শিহাব আয যুহরি, তাঁর থেকে ইমাম মালিক, তাঁর থেকে ইমাম
আশ-শাফে'ঈ, তাঁর থেকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল।

— হাদীসটি হলো:

“সবুজ পাখির মধ্যে শহীদদের রূহ অবস্থান করে। তারা জাহান্নামের
বৃক্ষসমূহের ফল ভক্ষণ করে।” [জামে আত-তিরমিজি: ১৬৪১]

হাদীসটির বিশেষত্ব হলো মাজহাবের চার ইমামের মধ্যে তিনজন এই হাদীসটি
একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

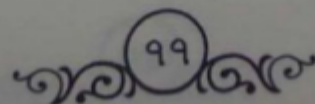


১৯৮ হিজরীতে আহমাদ শেষবার হজ্জ করেন। হজ্জে যাবার সময় তাঁর বন্ধু
ইয়াহিয়া ইবনে মা'ঈনকে বলেন, “আমি হজ্জের পর আব্দুর রাজ্জাক ইবনে
হিমামের কাছে হাদীস শিখতে ইয়ামেনের সা'না যাবো।”

সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো, আব্দুর রাজ্জাক সেবার হজ্জে আসেন। আব্দুর
রাজ্জাকের সাথে ইয়াহিয়া ইবনে মা'ঈনের দেখা হলে তিনি আহমাদের জন্য
এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখেন।

ইয়াহিয়া ইবনে মা'ঈন উৎসাহ নিয়ে আহমাদকে গিয়ে বলেন, “আমাদের তো
আর কষ্ট করে ইয়ামেন যেতে হবে না। যার কাছে গিয়ে হাদীস শিখতে চাচ্ছি
তিনি নিজেই এখানে চলে আসছেন।” ইয়াহিয়ার অতি-উৎসাহে আহমাদ পানি
তেলে বলেন, “আমি আমার নিয়্যাত করে ফেলেছি আব্দুর রাজ্জাকের সাথে
সা'নায় গিয়ে দেখা করবো। আর জ্ঞান মানুষের কাছে আসে না, মানুষই জ্ঞানের
কাছে যায়।” সুযোগ থাকা স্বত্বেও আহমাদ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে দেখাই
করলেন না।

হজ্জ শেষে আহমাদ সা'আনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এবার তাঁর আর্থিক অবস্থা
অন্যান্য সময়ের চেয়ে খারাপ। তাঁকে তাঁর বন্ধুরা সাহায্য করতে চাইলেন।
কিন্তু, আহমাদ তাঁদের সাহায্য না নিয়ে কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন।



রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“যে লোক জ্ঞানার্জনের জন্য রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ এর বিনিময়ে তাঁর জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।” [সহীহ মুসলিম: ৬৭৪৬]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন:

“যে লোক জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার পরিবর্তে তাকে জান্নাতের পথসমূহের মধ্যে একটি পথে পৌঁছে দেন। ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। জ্ঞানীর জন্য আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও দু'আ প্রার্থনা করে। এমনকি পানির গভীরে বসবাসকারী মাছও।” [সুনানে আবু দাউদ: ৩৬৪১]

আহমাদ নিশ্চয় এই হাদীসগুলো জানতেন। জ্ঞানার্জনের জন্য হাজার হাজার মাইল ঘুরার পেছনে হাদীসগুলো তাঁকে প্রেরণা যোগাতো।

কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে আহমাদ আব্দুর রাজ্জাকের বাড়িতে হাজির হলেন। আহমাদের জ্ঞান পিপাসা দেখে আব্দুর রাজ্জাক আনন্দিত হয়ে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। আহমাদ কয়েকদিন আব্দুর রাজ্জাকের সাথে থেকে ইবনু শিহাব আয যুহরি আর সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব হাদীসগুলো সংগ্রহ করলেন। আহমাদের আর্থিক দূরবস্থা দেখে আব্দুর রাজ্জাকের দয়া হলো। তিনি যাবার সময় আহমাদকে কিছু দিনার দিয়ে বললেন, “এগুলো রাখো। তুমি এমন এক জায়গায় আসছো যেখানে টাকা উপার্জন এতো সহজ না।”

আহমাদ বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, “আমার লাগবে না।”

আহমাদ বাগদাদ থেকে কুফা যান হাদীস সংগ্রহ করতে। যদিও বাগদাদ থেকে কুফা তেমন দূরে নয়, তবুও আহমাদকে বেশ কাঠখড় পোহাতে হয়। কুফায় গিয়ে তিনি আবাসন সংকটে পড়েন। ঘুমানোর সময় মাথার নিচে দেবার মতো একটা বালিশ ছিলো না। মাথার নিচে বালিশের বদলে ইট বিছিয়ে থাকতে হয়। তিনি আফসোস করে বলেন, “আমার কাছে যদি ৭০ দিরহাম থাকতো তাহলে

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ❁

আমি জারির ইবনে আব্দুল হামিদের কাছে হাদীস শিখতে যেতাম। আমার বন্ধুরা তার কাছে গিয়েছে, কিন্তু টাকার অভাবে আমি যেতে পাড়িনি।”

পড়ালেখার প্রতি তাঁর অদম্য ইচ্ছা দেখে কেউ কেউ চোখ কপালে তুলে তাঁকে প্রশ্ন করতেন- “আর কতোদিন আপনি পড়ালেখা করবেন?”

আহমাদ তাঁদের প্রশ্নের জবাবে এক রহস্যজনক উত্তর দিতেন— “কবরে যাবার আগ পর্যন্ত!”

জ্ঞানীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আহমাদ বলতেন, “সেই জ্ঞানী, যে জ্ঞান অন্বেষণ করে। আর যে মনে করে তাঁর জ্ঞান অন্বেষণ সমাপ্ত, সে আসলে মূর্খ।”

❁ তিন ❁

২০৪ হিজরী। আহমাদের বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো। এই বছর আহমাদের জীবনে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পদাঙ্ক হুবহু অনুসরণ করার জন্য আহমাদ চল্লিশ বছর বয়সে হাদীসের শিক্ষকতা শুরু করেন। এর আগে ২০৩ হিজরীতে তাঁর কাছে কিছু লোক আসেন হাদীস শেখার জন্য। কিন্তু, আহমাদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেন।

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যতোটা সম্ভব আক্ষরিকভাবে পালন করার ব্যাপারে তাঁর বেশ আগ্রহ। একবার হিজামা করে তিনি হিজামাকারীকে একটি দিনার দান করলেন। হিজামার বিনিময়ে এক দিনার দান করাটা ছিলো বেশি। কিন্তু, তিনি এই কাজটা করেন রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুনাত পালন করতে গিয়ে।

❁ চার তারা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার আবু তায়বাকে (রা:) দিয়ে হিজামা করান। বিনিময়ে তাঁকে এক দিনার সমপরিমাণ খেজুর দেন। [সহীহ বুখারী: ২১০২]

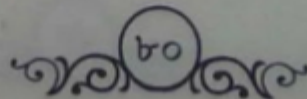
আহমাদ এই হাদীসটির আক্ষরিক অনুসরণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে ভ্রমণ করতে পছন্দ করতেন। তিনি বলেন, “তোমরা রাতে ভ্রমণ করবে। কারণ, রাতের বেলা জমিন সংকুচিত হয়।” [সুনানে আবু দাউদ: ২৫৭১]

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভ্রমণের হাদীস অনুসরণ করতে গিয়ে আহমাদ বেশিরভাগ সময় রাতের বেলা কোথাও সফরে বের হতেন।

চল্লিশ বছর বয়সে আহমাদ ‘ইমাম’ –এর আসনে বসার পাশাপাশি এই বছর বিয়ে করেন। মা বেঁচে থাকতে তিনি বিয়ে করতে চাননি। তিনি ভাবতেন, মা বেঁচে থাকাবস্থায় তিনি যদি বিয়ে করেন তাহলে স্ত্রী আর মা দুজনের হক একইসাথে আদায় করতে পারবেন না। মা ইন্তেকাল করার পর আহমাদ ইবনে হাম্বল প্রথম বিয়ে করেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম ছিলো আইশা। আহমাদ ইবনে হাম্বল জীবনের নানান চড়াই-উৎরাই পাড়ি দেন জীবনের শেষ বছরগুলোতে। তাঁকে জেল-জুলুম, নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। এই সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন আইশা। দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সাংসারিক অভিজ্ঞতা থেকে আইশা তাঁর ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন, “আহমাদ আমার সাথে কখনো দুর্ব্যবহার করেননি।”

আহমাদ ইবনে হাম্বল ইমামের আসনে বসলে তাঁকে ঘিরে জ্ঞানান্বেষীরা জড়ো হয়। বাগদাদের বিশাল মসজিদে বসে তিনি ক্লাস নিতেন। তাঁর ক্লাসে জড়ো হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবাই যে জ্ঞানান্বেষণের জন্য আসতেন এমন না। কিছু কিছু লোক আসতেন তাঁর ব্যবহার দেখে শিখতে, তাঁর কাছে বসে দ্বীনি কথা শুনে ঈমান মজবুত করতে। বাগদাদের বিশাল মসজিদে প্রায় পাঁচ হাজার শ্রোতার সামনে তিনি হাদীস নিয়ে বক্তৃতা দেন। সেখানে মাত্র পাঁচশো মানুষ ছিলেন যারা তাঁর কথাগুলো নোট করছিলেন। বাকিরা তাঁর আখলাক, কথা বলার ধরণ দেখার জন্য জড়ো হতেন।



ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ❀

আহমাদের সমসাময়িক একজন বলেন, “আমি ইমাম আহমাদের বাড়িতে মোট বারো বার গিয়েছি। প্রতিবারই দেখেছি তিনি তাঁর ছেলেদেরকে মুসনাদ পড়াচ্ছেন। আমি তাঁর কাছ থেকে একটি হাদীসও সংগ্রহ করিনি। আমি শুধু যেতাম তাঁর চরিত্রের মাধুর্য উপভোগ করতে।”

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের স্বভাব ছিলো গুরুগম্ভীর। রসিকতা তিনি তেমন পছন্দ করতেন না। তাঁর ক্লাসগুলোতে সবাই চুপচাপ বসে থাকতেন। হাসি-তামাশা করার সময় কেউ যদি বুঝতে পারতো আহমাদ আসছেন তাহলে তারা চুপ হয়ে যেতো। মনে হতো এতোক্ষণ ধরে কিছুই হয়নি।

একদিন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল দেখলেন তাঁর কিছু ছাত্র তখনকার সময়ের আরেকজন শিক্ষক ইমাম আল-কুরাইবীর কাছে পড়া শেষে বাসায় ফিরছে। ছাত্ররা ইমাম আহমাদকে দেখে ভাবলো, তিনি যদি জানতে পারেন যে, তাঁকে ছাড়াও অন্যদের কাছে তারা পড়তে যায়, তাহলে নিশ্চয় তিনি রাগ করবেন। তারা ভয়ে কাচুমুচু করছিলো। ইমাম আহমাদ ছাত্রদের দিকে এগিয়ে অভয় দিয়ে বললেন, “তোমরা কী শিখে এসেছো? আমাকেও শেখাও।”

কোথায় তিনি ছাত্রদের সাথে মন কষাকষি করবেন, তা না করে তিনি ছাত্রদের কাছেই শিখতে চাচ্ছেন।

❀ চার ❀

উমাইয়া খিলাফতকালে আল জা'দ ইবনে দিরহাম নামের এক লোক সর্বপ্রথম দাবী করলো- ‘কুর’আন আল্লাহর কালাম নয়, কুর’আন সৃষ্ট’। কুর’আনের ব্যাপারে এমন ‘অদ্ভুত’ মতবাদ তার আগে আর কোনো নামধারী মুসলিম করেনি। সে তার ভ্রান্ত মতবাদ থেকে ফিরে আসলো না। তার ভ্রান্ত মতবাদ ভাইরাসের মতো যাতে না ছড়ায় সেজন্য ইরাকের তৎকালীন গভর্নর খালিদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাসরী তার মৃত্যুদণ্ড দেন। পবিত্র ঈদুল আজহার দিন আল জা'দ ইবনে দিরহামকে জনসম্মুখে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

❀ চার তারা

কিন্তু এরইমধ্যে এই ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়েছে। মু'তাজিলা নামের একটা গ্রুপের অভ্যুত্থান হয় যারা আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করে। তারা অস্বীকার করে আল্লাহ মুসার (আলাইহিস সালাম) সাথে কথা বলেছেন, কুরআনকে 'কালামুল্লাহ' বলে তারা স্বীকার করেনা। সমকালীন অনেক আলেম তাদের কথাবার্তা শুনে প্রভাবিত হন। ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র বিশর আল-মারিসী মু'তাজিলার আকীদা গ্রহণ করলে আবু ইউসুফ তাকে অনেক বুঝানোর পর ফিরে না আসায় তার ক্লাস থেকে বহিস্কার করেন।

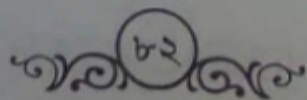
খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময় মু'তাজিলারা মানুষকে তাদের মতবাদের দাওয়াত দেয়। কিছু কিছু মানুষ তাদের দাওয়াত গ্রহণ করে। এক পর্যায়ে হারুন-অর-রশিদ মু'তাজিলাদের একটা দলকে ভ্রান্ত আকীদা প্রচারের অভিযোগে জেলে পাঠান।

আল-মামুন খলিফা হবার পর তিনি মু'তাজিলাদের কাছে টেনে নেন। মু'তাজিলাদেরকে এমনভাবে সম্মান প্রদর্শন শুরু করেন যেমনটা আর কারো জন্য ছিলো না। আবুল হিশাম আল-কাওতী নামের মু'তাজিলাদের ইমাম একবার তার কাছে গেলে তিনি আবুল হিশামের জন্য দাঁড়িয়ে সম্মান দেখান। এমনটা তিনি আর কারো জন্য করতেন না।

মু'তাজিলাদের কাছে টেনে নেবার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো আল-মামুনের শিক্ষক। আবু হুদাইল আল-আল্লাফ নামের মু'তাজিলাদের এক নেতা ছিলেন আল-মামুনের শিক্ষক। এই শিক্ষক আল-মামুনের মাথায় মু'তাজিলা আকীদা ঢুকিয়ে দেন।

খলিফা হবার পর আল-মামুন মু'তাজিলাদেরকে সবকিছুতে অগ্রাধিকার দেওয়া শুরু করেন। তাদেরকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেন। তার ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে রাখেন আহমাদ ইবনে আবু দু'আদ নামের এক মু'তাজিলাকে।

যখন মু'তাজিলারা বুঝতে পারলো খলিফা তাদেরকে সমর্থন করছেন তখন তারা তাদের মতবাদের জোড়ালো প্রচারণা শুরু করলো। ২১২ হিজরীতে আল-মামুন মু'তাজিলাদের সকল যুক্তি মেনে নিজেকে 'মু'তাজিলা' পরিচয় দেন। কিন্তু, জনসাধারণকে নিজের মত চাপিয়ে দেননি।



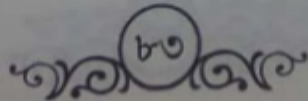
মু'তাজিলারা খলিফাকে নিজেদের দলে পেয়ে তারা নানানভাবে চাপ প্রয়োগ করে। তারা চাচ্ছে মু'তাজিলা মতবাদকে 'রাষ্ট্রীয় মতবাদ' —এ পরিণত করতে। দীর্ঘ ছয় বছরের চেষ্টার পর ২১৮ হিজরীতে আল-মামুন তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। মু'তাজিলা মতবাদ গ্রহণ করার জন্য আল-মামুন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে জোড় প্রয়োগ করেন। তাদের কাছে চিঠি লিখে মু'তাজিলা মতবাদের দাওয়াত দেন। যারা তার কথায় সাড়া দিতেন না তাদেরকে তিনি চাকরীচ্যুত করেন।

অনেকেই প্রাণের ভয়ে, জীবিকার চিন্তায় আল-মামুনের কথায় রাজী হয়। গভর্নররা রাজী হবার পর আল-মামুন চাইলেন সকল নাগরিক যেন তার মতবাদ মেনে নেয়। গভর্নরদের কাছে তিনি দ্বিতীয়বার চিঠি লিখে বলেন, “যারা 'কুর'আন সৃষ্ট' এই মতবাদ মানতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে শিকলবন্দী করে আমার দরবারে পাঠাও।”

বাগদাদের শুধুমাত্র চারজন আলেম ব্যতীত প্রায় সকল আলেম চাপের মুখে মু'তাজিলা মতবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তারা হলেন মুহাম্মদ ইবনে নূহ, আল-কাওয়ারিরী, সাজ্জাদা এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল।

কিছু কিছু আলেম রূপক অর্থে আল-মামুনের দাবী মেনে নেন। তারা হাতের চারটি আঙ্গুল ধরে ধরে বলেন— “তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, কুর'আন এই চারটি আল্লাহ সৃষ্ট।” যিনি প্রশ্ন করতে আসছেন তিনি বুঝে নিলেন তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল, কুর'আন এই চারটি আসমানি কিতাবকে তারা আল্লাহর সৃষ্ট বলেছেন। আসলে তারা মনে মনে আঙ্গুল গুণে আঙ্গুলকে ‘আল্লাহর সৃষ্ট’ বলেছেন, কিতাবগুলোকে নয়।

নিরাপত্তার স্বার্থে এই ধরনের মিথ্যাকে বলে ‘তাউরী’। হিজরতের সময় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথার বিনিময়ে একশো উট ঘোষণা করা হয়। এমন সংকটের মুহূর্তে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন তাঁর সাথে। পথিমধ্যে এক লোক আবু বকরকে (রা:) জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার সাথে যিনি আছেন তিনি কে?” রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন।



❁ চার তারা

আবু বকর (রা:) সুকৌশলে তার জবাব দেন, “তিনি আমার রাহবার— পথ প্রদর্শক।” আবু বকরের (রা:) কথা শুনে লোকটি ভাবলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মনে হয় পথ দেখিয়ে দেখিয়ে আবু বকরকে (রা:) নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু, আবু বকরের (রা:) বলার উদ্দেশ্য ছিলো— রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দ্বীনের পথ দেখান।

আল-মামুনের নির্দেশমতে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলসহ চারজনকে গ্রেফতার করে কোর্টে হাজির করার ফরমান জারি হলো। সকালবেলা গ্রেফতার করার সময় সাজ্জাদা মু'তাজিলাদের দাবি মেনে নেন। তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো। পরেরদিন আল-কাওয়ারিরীও মু'তাজিলাদের কথা মেনে নিলেন। তাঁকেও ছেড়ে দেওয়া হলো। অবশিষ্ট থাকলেন কেবল দুজন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং মুহাম্মদ ইবনে নূহ। ফিরে আসার পথে মুহাম্মদ ইবনে নূহ শহীদ হন। সঙ্গীদের হারিয়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল একা হয়ে গেলেন। তাঁকে একা একা শিকল পরিয়ে খলিফার কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওয়ান ম্যান আর্মি।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল যাত্রাকালে একটি দু'আ করেন। আল্লাহ যেন তাঁকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

“মজলুমের বদ-দু'আকে ভয় করো। কেননা তাঁর বদ-দু'আ ও আল্লাহর মাঝখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।” [সহিহ মুসলিম: ২৯]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল কোর্টে যাবার আগেই প্রহরীদের কাছে খবর আসলো খলিফা আল-মামুন ইন্তেকাল করেছেন। তার আসনে বসেছেন তার ছোট ভাই আল-মু'তাসিম। মৃত্যুর আগে আল-মামুন তার ভাইকে বলে গেছেন, “তুমি আমার মতবাদটি আঁকড়ে থাকবে। ‘কুর'আন সৃষ্ট’ এই মতবাদটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন হলে জোড় প্রয়োগ করবে।”

আল-মামুনের মতো আল-মু'তাসিমের জ্ঞানসাধনা নিয়ে কোনো চিন্তা ছিলো না। কুর'আন সৃষ্ট কি সৃষ্ট না এটা নিয়েও তার মাথাব্যথা থাকতো না যদি না তার ভাইকে কথা না দিতেন। আল-মু'তাসিম পুরোদমে একজন মিলিটারি ছিলেন।

ভাইয়ের কথা রাখতে গিয়ে সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে আঙ্গুল বাঁকা করে কিভাবে ঘি উঠাতে হয় সেই চেষ্টা শুরু করেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে তিনি জেলে প্রেরণ করেন। জুলুমের ভয় দেখিয়ে বলেন, “আমার কথা না মানলে আমি তোমাকে শাস্তি দেবো।” জবাবে আহমাদ বলেন, “আর তোমার কথা মেনে নিলে আল্লাহ আমাকে শাস্তি দেবেন।”

শুরু হয় ইমাম আহমাদের কারাবাস। তাঁকে নির্যাতন করতে করতে মাঝেমাঝে অজ্ঞান করে ফেলা হতো। শরীরে আঘাতের দাগ লেগে থাকতো। একবার নির্যাতন করার পর পরেরবার নির্যাতনের মাত্রা আগেরবারের চেয়ে বাড়ানো হলেও আহমাদ তাঁর বিশ্বাসে অনড়। এ যেন রাসূলের সাহাবী বিলালের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মতো অবস্থা! কাফেররা উত্তপ্ত বালুকণায় শুইয়ে তাঁকে বলছে, “বলো, তোমার প্রভু লাত-উজ্জা” আর তিনি বলেই যাচ্ছেন “আহাদুন আহাদ—(আল্লাহ) এক এক।”

দীর্ঘ ২৮ মাস কারাবাসের পর আল-মু’তাসিম দেখলেন আহমাদ নিজের বিশ্বাস থেকে সরে আসছেন না, দিন দিন তাঁর বিশ্বাস যেন শিসাঢালা প্রাচীরের মতো হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া অত্যাচার সহ্য করতে করতে আহমাদ বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। আল-মু’তাসিম ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে ছেড়ে দিলেন। মনে মনে ভাবলেন, এই মানুষটার কাছ থেকে যা শুনতে চাচ্ছি তা তো পাবোই না, উল্টো সময়-শ্রম দুটোই নষ্ট হচ্ছে।

‘কুর’আন আল্লাহর কালাম’ এর স্বপক্ষে আহমাদ যুক্তিতর্ক করেন, জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেন, প্রায় একাই খলিফাদের বিপক্ষে লড়াই করেন। তাঁর এই লড়াইয়ে অনেককেই তিনি পাশে পান। তাঁকে মানসিকভাবে সাহায্য করেন। শক্তি যোগান।

কারাগারে একজন মদ্যপায়ী আহমাদকে বললেন, “আপনি আপনার সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকুন। দেখুন না, মদ পান করার জন্য আমি শাস্তি ভোগ করছি তবুও মদের প্রতি আমার ভালোবাসা কমেনি। আর আপনি তো সত্যের পক্ষে লড়ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করবেন।”

❁ চার তারা

এর কয়েক বছর আগে ইমাম আশ-শাফে'ঈ মিসর থেকে তাঁর ছাত্র রাবিয়া ইবনে সুলাইমানকে একটি চিঠি দিয়ে আহমাদের কাছে বাগদাদ পাঠান। চিঠিতে ইমাম আশ-শাফে'ঈ লিখেন, “আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন, আহমাদকে আমার সালাম পাঠাও আর তাঁকে বলবে, আল্লাহ তাঁকে পরীক্ষা করবেন। সে যদি তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকে তাহলে আল্লাহ কিয়মতের দিন তাঁর মর্যাদাকে উন্নীত করবেন।” চিঠিটি পড়ে আহমাদ কেঁদে ফেলেন। তখন থেকেই নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুতি করা শুরু করেন। হাজারো বাধা তাঁকে তাঁর অবস্থান থেকে সরাতে পারেনি।

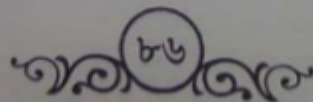
আল-মু'তাসিমের ইন্তেকালের পর খিলাফতের মসনদে বসেন আল-ওয়াসিক। আবারো নতুন করে শুরু আহমাদের উপর নির্যাতন। তবে এবারের পদ্ধতিটা ভিন্ন। আল-ওয়াসিক ইমাম আহমাদকে জানিয়ে দেন, “তুমি কারো সাথে দেখা করতে পারবে না। যে শহরে আমি বাস করি সেই শহরে তুমি বাস করতে পারবে না।” কারাগারের নির্যাতনের পর আহমাদের জীবনে শুরু হয় গৃহবন্দী নির্বাসন। মসজিদে গিয়ে জুমার নামাজ পড়ার অনুমতি পর্যন্ত ছিলো না।

আল-ওয়াসিক ইন্তেকাল করলে ‘কুর'আন সৃষ্ট’ এই ভ্রান্ত মতবাদটি রাষ্ট্রীয়ভাবে আর মাথাচড়া দিয়ে উঠতে পারলো না। এর পরের খলিফাদের কেউই এই মতবাদকে গ্রহণ করেননি। ইমাম আহমাদের একাগ্রতা এবং দৃঢ়তার ফলে মুসলিম উম্মাহ একটা ভ্রান্ত আকীদা থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ মুসলিমদেরকে কঠিন ফিতনা থেকে উদ্ধার করেন ইমাম আহমাদের মাধ্যমে।



ফিতনার বিপরীতে একা দাঁড়িয়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে যে পরিমাণ নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে যে, তাঁর সমসাময়িক অনেকেই মন্তব্য করেন, ‘আহমাদ যদি বনী ইসরাঈলের হতেন, তাহলে তিনি একজন নবী হতেন!’

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের সমসাময়িক একজন মুহাদ্দিস ছিলেন আলী ইবনে আল-মাদিনী। তিনি বলেন, “আল্লাহ দুজন মানুষের মাধ্যমে ইসলামকে রক্ষা করেছেন। রিদ্দার সময় আবু বকরকে (রা:) দিয়ে, আর মেহনার সময় আহমাদ ইবনে হাম্বলকে দিয়ে।”



ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ❁

আল-ওয়াসিক ২৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের পর খলিফা হন আল-মুতাওয়াক্কিল। তিনি ছিলেন অন্য তিন খলিফা থেকে একেবারে ভিন্ন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে তিনি সম্মান করতেন। তাঁর জন্য উপহার পাঠাতেন। আগের তিন খলিফার নির্যাতনের পর নতুন খলিফার উপহার দেওয়াকে আহমাদ ভাবলেন তাঁর জন্য নতুন এক পরীক্ষা। খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিল আহমাদের জন্য দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠালে আহমাদ এক দিনের মধ্যে সবগুলো অর্থ দান করে দেন। এমনকি খলিফার দরবার থেকে দেওয়া টাকার থলিটি পর্যন্ত।

ছেলেরা সরকারি চাকরি করতো বলে জীবনের শেষদিকে ছেলেদের ঘরে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেন আহমাদ ইবনে হাম্বল।

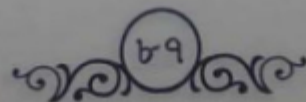
নবী-রাসূল, সাহাবী-তাবে'ঈদের দুনিয়া বিমুখতার ঘটনাগুলো সংকলন করে যিনি 'কিতাবুয যুহদ' লিখেন তিনি তো এমন দুনিয়া-বিমুখই হবেন।

.....
আব্বাহ পবিত্র কুর'আনে বলেনঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা তা কেন বলো যা তোমরা নিজেরা করো না?” [সূরা আস-সফ ৬১:২]
.....

❁ পাঁচ ❁

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের জীবনের সবচেয়ে বড় Mentor ছিলেন ইমাম আশ-শাফে'ঈ। শাফে'ঈর প্রশংসা তাঁর পরিবারের কাছেও করতেন। শাফে'ঈ যখন বাগদাদ আসেন তখন এক রাত আহমাদের বাসায় কাটান। আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর প্রিয় শিক্ষকের জন্য আদর-আপ্যায়নের সম্ভবপর সকল ব্যবস্থা করেন।

তাঁর ছোট মেয়েকে বলে রাখেন ইমাম শাফে'ঈর রাতের অজুর জন্য পানি



❁ চার তারা

রাখতে। বাবার কথামতো মেয়ে ইমাম আশ-শাফে'ঈর ঘরে পানি রাখলো। মেয়েটি খেয়াল করলো, শাফে'ঈ রাতে অজু করেননি, তাহাজ্জুদের নামাজও পড়েননি। আবার ফজরের আজান হলে অজু ছাড়াই নামাজ পড়লেন! খাবার দেওয়া হলে কম খাওয়ার সুন্নাত পালন না করে শাফে'ঈ পেট ভরে খেলেন। বাবার শিক্ষক সম্পর্কে মেয়ের মনে শাফে'ঈ সম্পর্কে যে ভক্তি ছিলো তা নিমিষেই একশো থেকে শূন্যে চলে আসলো।

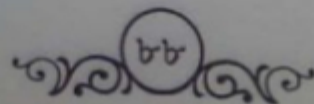
মেয়েটি বাবাকে গিয়ে বললো, “উনিই কি তোমার শাফে'ঈ? উনি এই এই কাজ করেছেন।” আহমাদ ইবনে হাম্বল নিজেও চিন্তায় পড়ে গেলেন। কিন্তু মেয়ের কৌতুহল তো মেটাতে হবে।

শাফে'ঈকে জিজ্ঞেস করেন ফেললেন, “আপনি এগুলো কেন করলেন?”

ইমাম আশ-শাফে'ঈ জবাব দিলেন, “কাল রাতে একটা হাদীস থেকে ফিকহ বের করতে গিয়ে আমার আর ঘুম আসেনি, ওজুও নষ্ট হয়নি। এজন্য তাহাজ্জুদের নামাজ আর ফজরের নামাজ পড়ার সময় ওজু করতে হয়নি। আর পেট ভরে খাবার কথা বলছো? আমার জানামতে বাগদাদের আর কোনো পরিবারে তোমার পরিবারের মতো হালাল খাবার রান্না করা হয় না। এজন্য আমি পেট ভরে তোমার পরিবারের হালাল খাবার খেলাম।”

ইমাম আশ-শাফে'ঈ আহমাদের আর্থিক দুরাবস্থা দেখে তাঁকে প্রস্তাব দিলেন, “তোমাকে একটা অঞ্চলের ক্বাদী বানানোর জন্য কি আমি খলিফাকে অনুরোধ করবো?” কারো করুণাপ্রার্থী হবেন এটা আহমাদের ব্যক্তিত্বের সাথে যায় না। তারউপর রাজদরবারের যাতায়াত তাঁর কাছে নীতিবিরুদ্ধ ছিলো। তিনি শাফে'ঈর প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়ে তাঁকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করেন। “এমন প্রস্তাব যদি আপনি আবার করেন তাহলে আপনি আর আমাকে দেখতে পাবেন না!” ইমাম আশ-শাফে'ঈ বুঝতে পারলেন আহমাদ স্বস্তির উপর কষ্টকে প্রাধান্য দিতে পছন্দ করেন।

যদিও ইমাম আশ-শাফে'ঈ ছিলেন আহমাদের শিক্ষক তবুও শাফে'ঈ হাদীসের বেলায় আহমাদের পরামর্শ চাইতেন। বাগদাদ ছাড়ার আগে তিনি আহমাদকে



বলে যান, “হাদীসের সহীহ-যঈফ নির্ণয়ে তুমি আমাদের চেয়ে বেশি পারদর্শী। যদি কোনো হাদীসকে তোমার কাছে সহীহ হাদীস মনে হয় তাহলে আমাকে জানাবে, হোক সেটা কুফা, মিসর অথবা সিরিয়ার।”

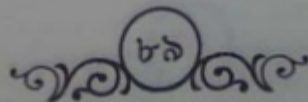
বাগদাদ ছাড়ার আগে ইমাম আশ-শাফে’ঈ বাগদাদবাসীকে বলে যান, “আমি তোমাদের কাছে আমার দেখা সবচেয়ে বুদ্ধিমান, আব্বাহওয়ালা এবং ফিকহের ব্যাপারে সবচেয়ে পারদর্শী একজনকে রেখে যাচ্ছি। আর তিনি হলেন আহমাদ ইবনে হাম্বল।”

❀ ছয় ❀

তিনজন খলিফার বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করে আহমাদ ইবনে হাম্বল মুসলিমদের প্রিয়পাত্রের পরিণত হন। তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁকে একনজর দেখার জন্য মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসতো।

একবার এক দীর্ঘ ভ্রমণ করে আহমাদ একটা মসজিদে আশ্রয় নেন। তাঁর ইচ্ছে ছিলো মসজিদে পুরো রাত কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু, অগত্যা ঝামেলা শুরু করলো মসজিদের পাহারাদার। সে আহমাদকে চিনতে পারেনি। পাহারাদার জিদ ধরে বললো, “আপনি মসজিদে থাকতে পারবেন না, বের হয়ে যান।” আহমাদ খানিফ্ফণ তার সাথে অনুনয় বিনয় করলেও সে মানতে রাজী না। শেষমেশ আহমাদকে মসজিদ থেকে বের করে দিলো।

একে তো রাত তার উপর প্রচণ্ড শীত। এই শীতের রাতে আহমাদ কোথায় আশ্রয় নিবেন? বাজারের একটা রুটির দোকানে গিয়ে দাঁড়ালেন। রুটিওয়ালা একজন বৃদ্ধ লোককে দেখতে পেয়ে তার দোকানে নিয়ে বসালো। আহমাদ খেয়াল করলেন, রুটিওয়ালা রুটি বানাচ্ছে আর ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ জিকির করছে। দৃশ্যটি তাঁকে অবাক করলো। তিনি রুটিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, “ব্যাপার কী? তুমি দেখি সারাক্ষণ আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ো!”



❀ চার তারা

যুবক বললো, “আমি এই জিকির করে অনেক কিছু পেয়েছি। আমি আল্লাহর কাছে যেই দু’আ করি না কেন, আল্লাহ আমার দু’আ কবুল করেন। শুধুমাত্র একটি দু’আ আল্লাহ এখনো কবুল করেননি।”

আহমাদের বিস্ময়ভাব আরেকটু বেড়ে গেলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কী দু’আ?” রুটিওয়ালা যুবকটি বললো, “আমি আল্লাহর কাছে অনেকদিন ধরে দু’আ করছি- হে আল্লাহ! আমাকে এই সময়ের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস আহমাদ ইবনে হাম্বলের সাথে দেখা না করিয়ে মৃত্যু দিও না।”

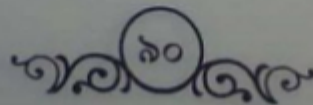
রুটিওয়ালা যুবকের কথা শুনে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল চোখের পানি আঁটকে রাখতে পারলেন না। আবেগপ্রবণ হয়ে বললেন, “যুবক, তোমার এই দু’আও কবুল হয়ে গেছে। আহমাদ ইবনে হাম্বলের দেখা পাবার জন্য তাঁর বাড়িতে যেতে হয়নি, আহমাদ নিজেই তোমার কাছে চলে এসেছে। তোমার দু’আ আমাকে মসজিদ থেকে তাড়িয়ে তোমার দোকানে নিয়ে এসেছে।”

খ্যাতি আহমাদ ইবনে হাম্বলকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। তাঁর জীবনটা ছিলো কবি গোলাম মোহাম্মদের গানের মতো- “খ্যাতির পাগল আমায় করো না কো, আমায় তোমার বান্দা করে রেখো।”

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল প্রায়ই বলতেন, “আমি যদি মক্কার কোনো গিরিখাতে থাকতে পারতাম তাহলে তো আমাকে কেউই চিনতো না। আমি সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর কাছে দু’আ করি আল্লাহ যেন মৃত্যুর বিনিময়ে হলেও খ্যাতির পরীক্ষা থেকে আমাকে মুক্তি দেন।”

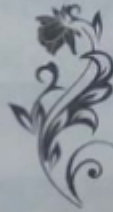
❀ সাত ❀

সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে তিনি জীবন পরিচালনা করেন, মেহনার ফিতনা থেকে তিনি উম্মতকে রক্ষা করেন। আহলুস সুন্নাহর আকীদাকে দূষণমুক্ত করার জন্য যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেন তাঁকে পরবর্তী সময়কার ইমামরা সম্মানিত করেন ‘আহলুস সুন্নাহর ইমাম’ বলে।



২৪১ হিজরীর ১২-ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল শেষবারের মতো নিঃশ্বাস নেন। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ার সাথে সাথে পুরো বাগদাদ যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

জুমার নামাজ পর তাঁর জানাজা হয়। প্রায় তিন লক্ষ মানুষ তাঁর জানাজায় অংশগ্রহণ করে। বাগদাদের আনাচেকানাচে থেকে মানুষজন সেদিন ভীড় জমায় তাঁকে শেষবারের মতো দেখার জন্য। বাগদাদের অনেক মসজিদে সেদিন আসরের নামাজ পড়ার মতো মুসল্লি ছিলো না। সবাই চলে গিয়েছিলো ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের জানাজা পড়তে। তখনকার সময়ে ইসলামের ইতিহাসে জানাজার নামাজে রেকর্ড পরিমাণ মুসল্লি অংশগ্রহণ করে তাঁর জানাজায়।



❁ চার তারা

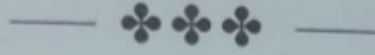
❖ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের উক্তি সমাহারঃ

- তুমি যদি চাও আল্লাহ তোমার পছন্দের বস্তুটি দিবেন, তাহলে আল্লাহর পছন্দের কাজটিও তুমি করো।
- যদি নিজের তাকদীর মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হতো, তাহলে সে নিজের জন্য তাই লিখতো, যা আল্লাহ তার জন্য লিখেছেন।
- গান-বাজনা অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে।
- যে সুন্নতের অনুসরণ করে, তাকে ততটুকুই ভালোবাসো, যতটুকু সে সুন্নতকে ভালোবাসে।
- মানুষকে তুষ্ট করার যেটা যখন বাদ দিলাম, তখন দেখলাম সত্য বলার শক্তি আমার বেড়ে গেছে।
- খাবার এবং পানির চেয়ে মানুষের জ্ঞান বেশি প্রয়োজন। একদিনে খাবার আর পানির প্রয়োজন তিন থেকে চারবার। কিন্তু, একদিনে জ্ঞানের প্রয়োজন তারচেয়ে বেশি।
- তারমধ্যে কল্যাণ নেই, যে নিজের মধ্যে কল্যাণ খুঁজে না।
- ভালো কাজের নিয়্যত করুন। যতক্ষণ ভালো কাজের নিয়্যত করবেন, ততক্ষণ ভালো থাকবেন।

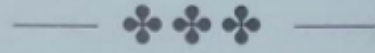


◆ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর সম্পর্কে কিছু কণ্ডল—

১. ইমাম যাহাবি বলেন, তিনি প্রকৃতই ছিলেন ইমাম, সত্যিকার অর্থে একজন শাইখুল ইসলাম। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/১৭৭, ইমাম যাহাবি। মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০২ হি.)



২. আবু বকর ইবনে আবি শাইবা বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল কোনো হাদিস বর্ণনা করলে তাঁকে এই কথা জিজ্ঞেস করার দরকার পড়ত না—কোথেকে বলেছেন হাদিসটা? (এতটাই প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন।) (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/১৮৬, ইমাম যাহাবি। মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০২ হি.)



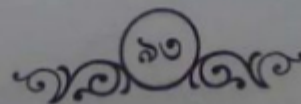
৩. আবু যুরআ রাযি বলেন, ইমাম আহমাদ যেদিন ইন্তেকাল করেন, সেদিন তাঁর সকল কিতাব হিসেব করা হয়। গুণে দেখা গেল বারো বোঝা হয়েছে। কোনো কিতাবের ওপরেই লেখা ছিল না—এতে অমুকের হাদিস আছে; কোনো কিতাবের ভিতরেও লেখা ছিল না—অমুক আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। সবকিছু তিনি মুখস্ত করে রাখতেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/১৮৮, ইমাম যাহাবি। মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০২ হি.)



৪. ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানি রহ. বলেন—আমি দুইশো মাশায়েখে ইলমের সান্নাৎ লাভ করেছি। কিন্তু একজনও আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতো দেখিনি। (মানাকিবুল ইমাম আহমাদ পৃ. ১৮৪, ইমাম বাইহাকি, দার হিজর, ১৪০৯ হি.)



৫. আবু সাওর বলেন—আহমাদ ইবনে হাম্বলকে যখন তুমি দেখবে, তখন মনে হবে—শরিয়ত তাঁর দুচোখের সামনে রেখে দেওয়া হয়েছে। (মানাকিবুল ইমাম আহমাদ পৃ. ১৬৬, ইমাম বাইহাকি, দার হিজর, ১৪০৯ হি.)



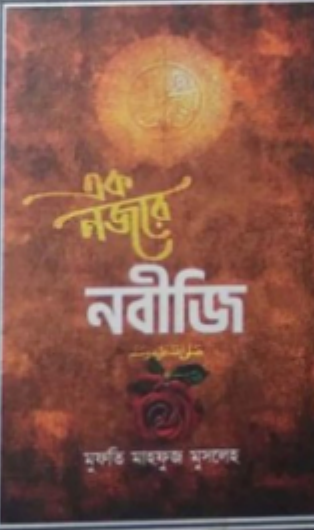
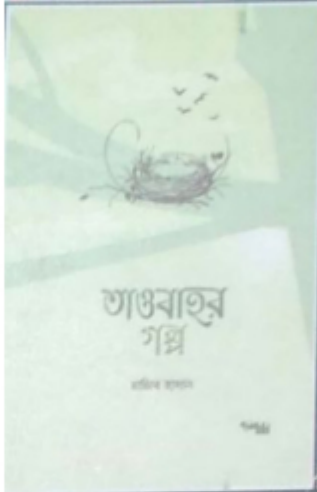
যেদ্রব ফুল দিয়ে গাঁথছি মান্না

■ বই এবং রিসার্চ পেপার:

- ১। চার ইমামের জীবনকথা
— রঈস আহমদ জাফরী
- ২। ইমাম আযম আবু হানিফা
— এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
- ৩। In the Company of Imams
— Dr. Salman al-Oadah
- ৪। The Four Imams: Their Lives, Works and their School of Thought
— Muhammad Abu Zahra
- ৫। Abu Hanifah: His Life, Legal Method and Legacy
— Mohammad Akram Nadawi
- ৬। Abu Hanifah: The Quintessence of Islamic Law
— John Paul Lamalan
- ৭। Revivers: Imam Ahmad Ibn Hanbal
— Osama Iqbal
- ৮। Imam Shafi'i
— Dr. Gabril Fouad Haddad
- ৯। Life of Imam Shafi'i
— Tarek Ibrahim
- ১০। Imam Malik- His Dedication in Compilation of Hadith Book Moatta
— Aziz-Ur-Rehman Saifee

আযান প্রকাশনী'র বই পরিচিতি

বই	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক
প্রকাশিত বই	
এসো জাম্মাতের গল্পগুনি	তানবীর হাসান বিন আব্দুর রফিক
দুআ কবুলের গল্পগুলো	রাজিব হাসান
তাওবাহর গল্প	রাজিব হাসান
দাজ্জাল	রাজিব হাসান
ছোট্ট কথন	রাজিব হাসান
শিকলবন্দী ক্ষমা	মূল : আলী আহমদ বা-কাসীর অনুবাদ : আব্দুল্লাহ মজুমদার
ভালোবাসা করে কয়?	শায়খ ইয়াসের বিরজাস
বিদায় বেলার অসিয়ত	মূল : ইমাম আবু সুলাইমান আর-রাবায়ী অনুবাদ : তানবীর হাসান বিন আব্দুর রফিক
ছড়া বই রঙিন রোদের কনে	মুসফিরা মারিয়াম
এসো ইয়াজুজ-মাজুজ চিনি	রাজিব হাসান
দুআ কবুলের গল্পগুলো-২	মুহিববুল্লাহ খন্দকার ও রাজিব হাসান
এক নজরে নবীজি	মুফতী মাহফুজ মুসলেহ
প্রকাশিতব্য বই	
সালাফদের সিয়াম	মূল: ড. সাদ্দিন বিন ওয়াহাব কাহতানি (রহ.) ও উম্মে আবদে মুনিব
ছোটদের নবীজি	মাহমুদুল হক জালীস
স্বামী-স্ত্রী	আব্দুল্লাহ মাহমুদ
বদান্যতার গল্প	মুফতী মাহফুজ মুসলেহ
তিনি আবার আসবেন [ঈসা (আ)]	রাজিব হাসান
ঘুম পাড়ানী গল্প	মোঃ শফিউল আলম



যাদেরকে জ্ঞাত দাত করা হয়েছে
আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উত্তর করবেন।

সূরা মুজাদালা, আয়াত ১১



৩৪, নর্থব্রুক হল রোড
(মাদ্রাসা মার্কেটের ২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
০১৭৫৯৫৯৯০০৮, ০১৭১৭৩১৭৯৩১
facebook.com/AzanProkashoni

